নারায়ণ

১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা] [ফাল্গুন, ১৩২১ সাল

কবিতার কথা

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে একটা গোল বাধিয়াছে। আমি ভাষার কথা বলিতেছি না, সাহিত্যেরই কথা বলিতেছি। এই সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষতঃ গীতিকাব্য লইয়া, নানাপ্রকারের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন আধুনিক বাঙ্গলা কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতার অভাব। আবার কেহ কেহ বলেন ভাবুকতাই মনুষ্যজীবনের সারাংশ। এই ভাবুকতা ছাড়িয়া দিলে কবিতা ফুটিবে কি করিয়া? প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি সাহিত্যে Realism ও Idealism লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিত, ইহা কতকটা সেই প্রকারের তর্ক। ইংরাজি সাহিত্যে ইহার একটা মোটামুটি রকমের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই মীমাংসা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Skylarkএর শেষ দুইটি ছত্রে আছে।

Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of Heaven and Home!

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য—এই দু'য়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই কি আমাদের কবিতার আদর্শ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে আমাদের প্রাণের মাঝে দুইটা ভাব সর্ব্বদাই

দেখা দেয়। একটা আমাদের মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে বলে, আর একটা আমাদের মাটি ছাড়াইয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরে। এই সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, এই দুই লইয়াই আমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারি না। ছাড়িয়া দিলে, মনুষ্যজীবন বলিলে যাহা বুঝায় তাহার অঙ্গহানি হয়।

মনুষ্যজীবন কি? আমরা প্রতিদিন যেমন করিয়া জীবনযাপন করি তাহাই কি প্রকৃত জীবন? আমরা সকলেই সকালে উঠিয়া যে যার কর্ম্মে নিযুক্ত হই, সমস্তদিন কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসি এবং তৎপরে বিশ্রাম করি। যাহার কর্ম্ম করিতে হয় না সেও শয্যা হইতে উঠিয়া কোন রকমে গল্প করিয়া, তামাক টানিয়া দিনটা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনের বহিরাবরণ। ইহার আর একটি দিক্ আছে। তাহাকে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতি বলা যাইতে পারে। যে সমস্তদিন কর্ম্ম করিয়া কাটায়, সেও মাঝে মাঝে, ভাবিতে ভাবিতে, তাহার কর্ম্মের সার্থকতা যেখানে, সেই রাজ্যে গিয়া পৌঁছায়। যে সমস্ত দিন আলস্যে অতিবাহিত করে, সেও একেবারে অসার না হইলে, মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতে পায়, আর সেই বংশীরবে সে আর একটা রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। এই সব মুহূর্ত্তগুলি জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত। এই মুহূর্ত্তেই আমরা প্রকৃত জীবনযাপন করি এবং আমাদের ও অপরের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সার্থকতা বুঝিতে পারি। কৃষকের জীবন লইয়া সে'ই কবিতা লিখিতে পারে, যে কৃষকের জীবনের সার্থকতা বুঝিয়াছে। কেমন করিয়া কৃষক প্রাতে উঠিয়া পান্তা ভাত খাইয়া লাঙ্গল লইয়া মাঠে যায়। কেমন করিয়া সে চাষ করে, সে চাষ করিতে করিতে কি গান গায়, সে বাড়ী ফিরিয়া কেমন করিয়া বিশ্রাম করে, কি খায়, কি পরে—এই সব খুব জাঁকাল রকমের ভাষায় বর্ণনা করিলেও কবিতা হয় না। কেবল একখানি সুন্দর আলোক-চিত্র হয়।

আজকালকার দিনের অনেক কৃষক-বিষয়ক কবিতা এই প্রকারের। এই সব কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বস্তু-তন্ত্রতা নাই ;—যাহা লইয়া কৃষকের জীবনের সার্থকতা, তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। কৃষক বুঝুক আর নাই বুঝুক, তাহার দৈনন্দিন বাহিরের জীবনের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই অন্তঃপ্রকৃতির অনুভূতি যার নাই, সে কখনই কৃষকের জীবনকে আপনার করিয়া লইতে পারে না। সে যাহা বুঝে ও যাহা ধরে, তাহা বাহিরের খোসামাত্র। সেই খোসা লইয়া যাহা লেখা যায় তাহা কবিতা নয়। যে কবি সেই জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পাইয়া, সেই জীবনের ভিতর ও বাহির দুই দিক্‌কেই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারেন, তিনিই যথার্থ কৃষকের কবিতা লিখিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বার্ণ্‌সের Ploughmanএর কথা বলা যায়। আধুনিক বাঙ্গলা কবিতায় কালিদাস বাবুর "পর্ণপুটে" কৃষকের ব্যথা নামক একটী কবিতা যথার্থ কৃষকের কবিতা—

ক্ষেতের কাজ করিতে গিয়ে উদাস হয়ে যাই
কাজেতে আর নাইক মন, আরামে সুখ নাই।
তোমার সেই কাজল চোখ মনে যে উঠে জ্বলি,
ধানের চারা উপ্‌ড়ে ফেলি আগাছা কাঁটা বলি'।

* * * *

শান্তিপুরে', তোমার ডুরে', এবুকে চাপি ধরি,
চোখের জলে বক্ষ ভাসে মেজেতে রহি পড়ি।

কৃষকের কবিতার বিষয় যাহা বলিলাম, সব কবিতার বিষয়েই তাহা খাটে। শুধু নায়ক-নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌঁছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্যজীবন। সক-

লেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জ্ঞানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত বলিলাম, সেই অনন্তমুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয় মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখনই কবিতার সৃষ্টি হয়।

তবে কবিতার রাজ্য কোথায়? আমি পণ্ডিত নহি, কথা লইয়া তর্ক করার অভ্যাস নাই। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ধরণী আকাশের গায় ও আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া গিয়াছে। এ মিলন অপূর্ব্ব, গভীর, অনন্ত! দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম এই ত জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সেই মিলনভূমি, অপূর্ব্ব, অনন্ত! বুঝিলাম, যাহা আত্মা তাহাই দেহ, যাহা অনন্ত তাহাই সান্ত, যাহা পরমার্থ তাহাই সংসার।

জীবন এই মহামিলনমন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই—যাহা আছে তাহাই জীবনের স্বরূপ! এই জীবন লইয়াই কবিতা! যে শুধু ছোব্ড়া খায় সে কখনও ফলের স্বাদ পায় না। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায়, সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোব্ড়া না ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সেও ফলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিতলোক সৃজন করে মাত্র। শূন্য আকাশে যেমন গৃহ নির্ম্মাণ করা যায়

না, সেইরূপ এই কল্পিত-লোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই কল্পিত-লোকের কোন সত্তা নাই। এ মিলনমন্দির সত্য। সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।

আমি দু'একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি"—

কবি তখন একেবারে রাধিকার মনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া সেই মহামিলনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি!
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়ে যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি!"

আজকাল এরূপ কবিতা শুনিতে পাই না! আর কি শুনিতে পাইব না?

রাধিকার পূর্ব্বরাগের কথা মনে করুন!

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

এও সেই মহামিলনমন্দিরের গীতধ্বনি! যাঁহারা শুধু বাহিরের দিক্‌টা দেখেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, "পূর্ব্বরাগে আবার মিলন আসিল

কোথা হইতে?” আমি যে মহামিলনের কথা বলিতেছি তাহাই যে জীবনের স্বরূপ,—পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বিরহ ইত্যাদি সেই স্বরূপেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং পূর্ব্বরাগের গীতই হউক, কি মিলন অথবা বিরহের গীতই হউক, জীবনের সকল গীতই সেই মহামিলনমন্দিরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। যিনি যথার্থ কবি, তিনি সেই মন্দিরে পৌঁছিয়া তাহারি গান বুকে করিয়া বহন করিয়া আনেন। তাই আজ এত বৎসর পরেও এই কবিতাটি পড়িলেই মনে হয়—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!

চণ্ডীদাস যে সাধক ছিলেন। তিনি যে নামের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নায়ক-নায়িকার নাম লইয়া লিখিত দুইটি কবিতা আমার মনে পড়িতেছে। একটি এই—

শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি শুনেছি তাহা
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা!
নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী নলিনী নলিনী নাম।
বালার খেলার সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে
স্বজনেরা তায়, নলিনী নলিনী
নলিনী বলে গো তাকে!
নলিনীর মত হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম!

আর একটি এই,—

ভালবেসে সখি! নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো তোমার
চরণ-মঞ্জীরে!

বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাসের কবিতা যে রাজ্যের, এ দুটি কবিতা সে রাজ্যেরই নয়—সে মহামিলনমন্দিরের অনেক দূরে।

প্রেমে ডগমগ-হৃদি রাধিকা নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। সে ভাবিতেছে তাহার কি হইল। সে যে সংসারে থাকিয়াও সংসারে নাই। সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, অথচ প্রেমের যে প্রভাব তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে,—

সই! পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাত দিন॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত।
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতিকুল।
সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাহিল হিয়া।

সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে
নিবারিব কি না দিয়া।
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে।

রাধিকার হৃদয়দর্শী চণ্ডীদাস, রাধিকার হৃদয়ের কথা সকলই জানেন। সংসারে থাকিয়াও যে সে সংসারের বহুদূরে তাহা তিনি জানেন। তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ আছয়ে ঘরে বটে, কিন্তু ইঙ্গিত পাইলে অনল দিয়ে দুয়ারে"। আর একটি কবিতাতে কবি বলিতেছেন, "তোমার এ রকম ত হবেই। তুমি যে

পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি বাস।"

তারপর মিলনের ও সম্ভোগের কথা। মিলনের মাঝে রাধিকা লিতেছে—

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা!

এ ত শুধু বাহিরের সঙ্গীত নহে, এ যে অন্তর্দৃষ্টি পরিপূর্ণ! শ্যামের প্রেমে গদগদ-প্রাণ রাধিকা এ কোন শ্যামের অনুসন্ধান করিতেছে? ণ্ডীদাস জানে; রাধিকা না জানিলেও তাহার হৃদয় জানে। তাই সে মিলনের মধ্যেও গাহিয়া উঠিল

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা!

প্রত্যেক মিলনের মধ্যেই একটা বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকে। এ গান তাহারি প্রথম সূত্র। এই বিরহ তারপর সম্ভোগে আরও সুন্দর ভাবে, গভীর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

ইহার পরের অবস্থাই বিদ্যাপতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরোপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝিনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

কেমন করিয়া নয়ন তিরোপিত হইবে, নয়ন যে অতৃপ্য! কেমন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে, প্রাণ যে জুড়াইবার নয়! আমরা যে ইন্দ্রিয় দিয়া অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে চাই। তাই প্রত্যেক মিলনের মধ্যে মহা-মিলনের অনুসন্ধান করি, তাই সম্ভোগেও এক মহাবিরহের ছায়া পড়ে, তাই সম্ভোগ-মিলনের মধ্যেও নায়িকা গাহিয়া উঠিল—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি!

এই কবিতা গুলি Realisticও নয় Idealisticও নয়; আমি যে মহামিলনমন্দিরের কথা বলিয়াছি তাহারি ধ্বনি। এগুলি জীবনের কবিতা, ইহাতে জীবনের ধ্বনি পাওয়া যায়। তাই আমরা এ কবিতাগুলিকে কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

ইহাই হিন্দুর আন্তরিক ভাব। ইহাই বাঙ্গালীর কবিতার প্রাণ।

বঙ্গসাহিত্যে—চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্য্যন্ত—এই কবিতার একটা অক্ষুণ্ণ ধারা দেখিতে পাওয়া যায়!

সে ধারা কোথায় লুকাইয়া গেল? আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না কেন? ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে বাঙ্গলা কবিতার যে প্রাণ তাহাই হারাইয়া ফেলিব? আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের একথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, কবিতা কি চিরকাল এক রকমেরই থাকিবে? আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের পরিসর বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কবিতাকে সেই পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া দিলে কেমন করিয়া চলিবে? কিন্তু আমি ত কোনও গণ্ডীর কথা বলি নাই, আমি কবিতার রাজ্যের কথা বলিয়াছি, কাব্য-লোকের কথা বলিয়াছি। এই কাব্য-লোকের কোন সীমা নাই। এ রাজ্য অসীম, অনন্ত। জীবনের পরিসর যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া থাকে, কবিতার বিষয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইব্‌সেন্ হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া কবিতার বিষয় সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। নানা ফুলে মধুপায়ী ভ্রমরের মত মেটারলিঙ্কের পত্রে পত্রে মধু আহরণ করা চলিতে পারে। আমরা সে বিষয়-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া কবির নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু কবি যদি সেই কাব্য-লোকে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার কবিতা বৃথা। একদিনে তাহা লোকের মন চমকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জিনিস নহে। বিষয় যাহাই হউক না কেন, কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই, সেই মহামিলনমন্দিরের সাধক হওয়া চাই। সে অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন আবশ্যক। সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই—ভাসা চাই—ডুবা চাই! নতুবা দূরে দাঁড়াইয়া, বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মনগড়া, কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদী রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না।

বাঙ্গলা কবিতায় সেই সরল সত্য প্রাণ আমরা হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই আমাদের কবিতার ভাষা ও ধরণ ক্রমশঃ কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া আসিতেছে। আজকালকার দিনে

এই হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল—

এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার আবশ্যক হয়। ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছানিয়া বুনিয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিতে হয়। তা' না হইলে নাকি কবিতা হয় না। আজকাল আমরা সবাই খেলোয়াড়। কবিতা লিখিতে গিয়া খেলিতে বসি। একটি ভাব কোন রকমে জোগাড় হইলেই তাহাতে ভাষার রং মাখাইতে বসি এবং সেই রঙ্গিন জিনিসটাকে লইয়া, বল খেলার মত তাহাকে আছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির হৃদয় হইতে কোন ভাবই সহজে, সরল ভাবে, পাঠকের মনে আসে না। কবি যেন তাহাকে তাঁহার মন হইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করেন, আর সেই অবসরে পাঠকেরা একটু একটু দেখিয়া লয়, আর কবির ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে।

কিন্তু ইহা ত বাঙ্গলা কবিতার ধরণ নয়। যে পরিমাণে প্রাণের অভাব হয়, সেই পরিমাণেই ধরণের মাত্রা বাড়িয়া যায়। বাঙ্গলা কবিতার ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। তাই আজকাল বাঙ্গলা কবিতাতে আন্তরিকতার এত অভাব ও ধরণের এত বাড়াবাড়ি।

সেই সোজা সরল ধরণের দুই একটি কবিতা মনে পড়িতেছে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা ঐ ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কবিতায় অনুপ্রাসের বাহুল্য থাকিলেও তাঁহার ভাষা ও ধরণ অনেকটা সেই প্রকার সহজ, সরল, প্রাণময়—

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরূপম
নয়ন ত মম মনোমত নয়।

যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন
হতেছিল সম্মিলন ;
নয়ন পলক দিলে, সেই সুখের সময়!

ইহাতে খেলিবার চেষ্টা নাই,—ইহার গতি সরল! আবার দেখুন,—

মন যে আমার পড়েছে সই উভয় সঙ্কটে।
এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,
আর এক কর্ণ বলে, আমি বধির হয়ে র'ব।
এক নয়ন বলে, আমি কৃষ্ণরূপ দেখি,
আর এক নয়ন বলে, আমি মুদিত হয়ে থাকি।
এক করে সাধ করে, ধরে কৃষ্ণ করে,
আর এক করে, করে করে নিষেধ করে তারে।
এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়
আর এক পদে, পদে পদে বারণ করে তায়।

রাধিকা কৃষ্ণবিরহে অজ্ঞান। সখীরা তাহার কানে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল। অমনি রাধিকার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি!

বহুদিন পরে মোরে মনে করে
এসেছিল ঘরে বঁধু যে আমার।
আমি জান্‌লাম জান্‌লাম—
বঁধুর শ্রীঅঙ্গের গন্ধে পশি নাসারন্ধ্রে,
মৃতদেহে কর্‌লে জীবন সঞ্চার।
সখি! আমি ছিলাম অচেতনে,
ভাল, তোরা ত ছিলি চেতনে,
হায় হায়! যতনে রতনে, পেয়ে নিকেতনে,
কেন অযতনে হারালি আবার।

এইরূপ ভাষা এখন আর শুনিতে পাই না। নিধুবাবুর "তোমারি তুলনা প্রাণ তুমি এ মহীমণ্ডলে", কিম্বা বিহারীলালের—

"নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সি আমার!"

এইরূপ অনেক কবিতা বঙ্গভাষার আদরের সামগ্রী।

আজকালকার কবিতা পড়িলে মনে হয় যেন আমাদের
ভাষা, ধরণ, সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভাষা
প্রকারের, আমরা প্রত্যেক কথাই এত ঘুরাইয়া বলি যে সাদা
লোকে বুঝিতে পারে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের
বক্রগতি। তা'র ঝঙ্কারে এত প্রকারের রাগরাগিণী-আলাপ থাকে
যাহার যথেষ্ট সুরবোধ আছে সে ভাব বেচারাকে একেবারেই অ
দেয় না, আর যে হতভাগ্যের যথেষ্ট সুরবোধ নাই সে অ
চেষ্টা করিয়াও পড়িতেই পারে না।

আমাদের কবিতার এই শোচনীয় অবস্থার হয় ত যথাযথ
আছে। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপণ্ডিত তাঁহারা বলিতে পা
কিন্তু যথেষ্ট কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে ত মন
না। প্রাণ যে চায় সেই বৈষ্ণব কবিদিগের সব-জুড়ান সুধাস্রো
মন যে চায় সেই বাঙ্গালীর কবিতা। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জ
সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেই হ
কবিতা লইয়া আর খেলাধূলা ভাল লাগে না। সংসারের খে
খেলিতে খেলিতে যাহারা প্রাণের বস্তুর সাক্ষাৎ পায় তাহারা
বিকই ধন্য। কিন্তু যাহারা প্রাণের বস্তু লইয়া খেলা করি
তাহাদের মত দুর্ভাগ্য আর কার? বঙ্গসাহিত্যের সেই হারাণ
আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে মরে নাই, এ
বিলুপ্ত হয় নাই,—সরস্বতী নদীর মত বালুকারাশির মধ্যে
আছে। সেই বালি খুঁড়িয়া তাহাকে বাহির করিতে হইবে।

আমি পণ্ডিত নহি, দার্শনিকও নহি, কিন্তু আশৈশ
সেবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বড় বড় লেখকের
কি লেখেন, আমি হয় ত ভাল করিয়া জানি না।
...বার ক্ষমতাই নাই। কিন্তু বাঙ্গলা কবিতার
... জানি। তাহা...

রবান্বিত মনে করি। আমার হাতের কলম কেহ কাড়িয়া লয়
, সত্য। কিন্তু আমি ত সাধক নই, সাহিত্যমন্দিরপ্রাঙ্গণে সামান্য
র মাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই।
দের আছে তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী!
আজ পরিণত বয়সে ওপারের কথাই বেশী মনে হয়। আমি
া ছাই হইব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কবিতামন্দিরে
যাহাকে বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা
। আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার
কে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষে সব স্পষ্ট
ত পাইতেছি। দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় সেই মহামিলনমন্দিরের
আমার কানের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।
আবার সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। সকল সাহিত্য সেই প্রাণ-
ষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

তা বৈষ্ণবের নিকটে পৌরাণিকী কৃষ্ণলীলা-কথা ছিল কৃষ্ণ-
প ; আর তাঁহাদের অপরোক্ষ অনুভূতিপ্রত্যক্ষ কৃষ্ণতত্ত্ব ছিল
রই স্বরূপ। স্বরূপ ভুলিয়া লোকে রূপে সর্ব্বদাই মজিয়া
আবার কেহবা রূপকে উড়াইয়া দিয়াও অরূপ স্বরূপের
গিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা উভয়েই একদেশদর্শী। ইহাদের
সত্যবস্তুর বা তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না।
ও তত্ত্ববস্তু কেবল রূপেতেও থাকে না, আর শুদ্ধ স্বরূপেও
হয় না। রূপের ভিতর দিয়াই সর্ব্বদা স্বরূপের প্রকাশ
নিত্য, স্বরূপ নিত্য। রূপ পরিণামী—তার উৎপত্তি,
লয়াদি আছে। স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ—তার উপচয় অপচয় নাই।
তে অনিত্যকে ধরিয়াই নিত্যের প্রকাশ হয়। নিত্যের
ত্যের অনিত্যতারও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। নিত্য আর
তপের মত পরস্পরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া আছে।
ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে এই সৃষ্টি প্রবাহের বা চঞ্চল জগতের সম্বন্ধ
রিতে যাইয়া ব্রহ্মবিদেরা এই ছায়াতপের সঙ্গেই ইহাদের
করিয়াছেন,—"ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।" পৌরাণিকী
কৃষ্ণতত্ত্বের রূপ বলিয়াই, এই কাহিনীকে ছাড়িয়া অন্ততঃ
দের পক্ষে ঐ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।
নীকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের প্রাণে ঐ তত্ত্বের স্ফুরণ
কে। আর এই স্ফুরণমাত্রই এই কাহিনীর প্রকৃত মর্ম্মও
গত হইতে আরম্ভ হয়।

ার গতানুগতিক বৈষ্ণবমণ্ডলী স্বরূপ ভুলিয়া কেবল কল্পিত
তই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই এতটা করিয়া রূপ যে
নহে, এই কথাটা বলিতে হয়। কৃষ্ণতত্ত্বকে ভুলিয়া তাঁহারা
ক কৃষ্ণলীলাতে ডুবিয়া আছেন বলিয়াই, পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের
তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্যটা এমন জোর করিয়া বলা প্রয়োজন।
যে কৃষ্ণবস্তু, তাঁহারই নিত্যলীলাকে পুরাণের কৃষ্ণলীলায়

আশ্রয়ে বর্ত্তমান কৃষ্ণকথার আকারে বিকশিত হইয়া উঠি
দুই অনুমানের যেটিই সত্য হউক না কেন, এখন কৃষ
অবলম্বন করিয়াই যে ক্রমে ক্রমে আমাদের অন্তরে কৃষ্ণতত্ত
হইয়া থাকে, একথা অস্বীকার করা অসাধ্য। এখন তত্ত
কাহিনীতে এমন একটা ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গি
জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞাতে এই দুইকে একান্তভাবে পৃ
একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

আর এই জন্যই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুপর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ
তত্ত্ববস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াও পুরাতন ও
কাহিনীকে বর্জ্জন করেন নাই। বর্জ্জন করিতে পারিতে
মনে হয় না। তিনি যে কৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,
রায় প্রাচীনকাল হইতে তাহা উপদিষ্ট হইলেও, অল্প
প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিত। এই তত্ত্ব একরূপ অজ্ঞাতই ছিল।
ণিকী কৃষ্ণকাহিনী সকলেরই জানা ছিল। যে শ্রীকৃষ্ণের
লোকে ভাগবতাদি পুরাণে পড়িত, কিম্বা জয়দেব, বিদ্যাপতি,
প্রভৃতি মহাজনগণের পদাবলীতে শুনিত, তাহারা তাঁহার
করিত। যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতেন, তাঁহারাও এই সকল
অনুশীলন করিয়াই সেই অতীন্দ্রিয় রস আস্বাদন করিতেন
কৃষ্ণকথা কহিতে যাইয়া তাঁহাদের পক্ষে পুরাতন পৌরাণি
নীকে একেবারে বর্জ্জন করাও সম্ভব ছিল না। ফলতঃ তাহা
রাও যে ঐ পৌরাণিকী কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই ক্রমে কৃষ
সন্ধান পান নাই, এমনও বলা যায় না। রূপ আর স্বরূ
সম্বন্ধ, আমাদের দেশের প্রাচীন বৈষ্ণব সাধনায় পৌরাণিকী
কথার সঙ্গে শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের কতকটা সেই সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া
ছিল। মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের নিগূঢ় আলাপে
প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকে যে ভাবেই বুঝুক না কেন,
আপন প্রাণগত সাধনেতে যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্বকে ধরিয়াছিলে

আর আদ...
লেন, না পুরাণের কৃষ্ণকাহিনীই আগে রা...
কথাও বলা সহজ নহে। হয় ত বা তত্ত্বকে
মরা যে কৃষ্ণকাহিনী এখন শুনিতে পাই, তাহার
গবতেই এই কৃষ্ণকাহিনীটি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠি...
বত যে উপনিষদের পরে রচিত হয়, এ বিষয়ে কোন
তে পারে না। ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ম...
র অকাট্য প্রমাণ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি শব্দে
নে বাদরায়ণ সূত্রকে স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করিতেছেন দেখিয়া,
ব্রহ্মতত্ত্বের উপরেই যে ভাগবতের কৃষ্ণতত্ত্ব ফুটিয়াছে,
অস্বীকার করা অসম্ভব হয়। ফলতঃ উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্ব
ক প্রাকৃত জনের বোধগম্য করিবার জন্যই যাবতীয় পৌরা-
কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে, পুরাণবাদিগণও একথা অস্বীকার
ন না। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্বের আশ্রয়ে কৃষ্ণকাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে,
মতকেও একেবারে সরাসরিভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে
ঃ একটি প্রাকৃত কৃষ্ণকাহিনী অতি প্রাচীনকাল হইতেই, কোনও
কোনও আকারে, চলিয়া আসিয়াছিল; উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন কৃষ্ণকাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই
বতাদিতে কৃষ্ণতত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই অনুমানই সমধিক সঙ্গত
য়া মনে হয়। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বই আগে প্রকাশিত হইয়াছিল আর
তত্ত্বকে ধরিয়াই ক্রমে পৌরাণিকী কৃষ্ণকাহিনী ফুটিয়াছে, অথবা
নীটি আগেই কেবল লৌকিক প্রেমের সরল ও সরস চিত্ররূপে সৃষ্ট
ছিল, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হইলে সেই আদি কাহিনীই এই তত্ত্বের

...তর প্রত্যক্ষ রূপর
যাইয়া, অভিনব ভাবাঙ্গস্ফুরণের সঙ্গে স
স্তরে যে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়াছি, তিনি পুরা
নার শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কিন্তু তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ; এব
ও, ঐ পৌরাণিকী কল্পনাকে ছাড়িয়া কোন দিন
ষ্ণতত্ত্বের কোনই সন্ধান পাইতাম না, একথাও অসত্য ন
ষ্ণতত্ত্ব কাহাকে বলে, ইহা যখন জানিতাম না, এমন
প্রকারের তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় যখন হয় নাই, তখনও ঐ
কৃষ্ণকাহিনী শুনিয়াছিলাম। আর সেই পুরাণ-কথা
ছিলাম বলিয়াই, এই কৃষ্ণবস্তু যে তত্ত্ববস্তু, কেবলমাত্র
নহে, ইহা আজ একটু একটু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

কেবল আমাদের দেশেই এই অপূর্ব্ব কৃষ্ণকথা প্রচলিত
জগতের আর কোনও দেশে এইরূপ কোনও পুরাণ-কাহিনী
বলিয়া জানি না। পুরাতন বাইবেলের সলোমনের গীতে
একটি কাহিনীর অতি সামান্য আভাস পাওয়া যায় বটে,
ইহুদার ধর্ম্মসাহিত্যে এটি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই।
নিক খৃষ্টীয়ানেরা এই কাহিনীকে যিশুখৃষ্টের সঙ্গে খৃষ্টীয়ান্ স
বা চার্চ্চের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা ক
থাকেন। এই রূপকথা ছাড়া, সলোমনের গীতের মধ্যে আর কে
তত্ত্বকথা বীজাকারে লুকাইয়াছিল কিনা, এখন এই প্রশ্নের মীমাং
সম্ভবপর নহে। আমরা জগতের যে সকল ধর্ম্মের খবর রাখি
সকল ধর্ম্মের তত্ত্বের ও সাধনের ইতিহাস আমরা জানি, যে
পুরাতন সাধনার সঙ্গে আজকালকার শিক্ষিত লোকের

কবি-কল্পনাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই রূপককল্পনাও "সাধকানাং হিতার্থায়'ই হইয়াছে। সাধনের সৌকর্য্যসম্পাদনই ইহার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কল্পনা হইলেও ইহা নিতান্ত অবস্তু নহে। এ কল্পনা সত্যো-পেত এবং বস্তুতন্ত্র। পুরাণে, বিশেষতঃ ভাগবতে, যে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে, তাহাতে নিত্যবস্তুকেই ফুটাইতে চাহিয়াছে। নিত্যলীলা দেশকালের অতীত। এই পৌরাণিকী কল্পনা সেই লীলাকেই দেশ-কালের ভিতরে ভাবিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই লীলার দেশকালগত সম্বন্ধসকল কল্পিত হইলেও, যে রস ইহাতে ফুটিয়াছে তাহা সত্য, কল্পিত নহে। আর এই পৌরাণিকী কৃষ্ণলীলার রসটুকু সত্য, সার্ব্ব-ভৌমিক ও সনাতন বলিয়াই, আমরা এই পৌরাণিকী কাহিনীর ভিতর দিয়াই শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের ও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার সন্ধান পাইয়া থাকি। অতএব পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণের যে একটা নিগূঢ়, ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই কথাটাও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

আর আমি যে তত্ত্বকথা বলিতে চাহিতেছি, পুরাণের কৃষ্ণকথার সঙ্গে তার এই ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহাকে কৃষ্ণতত্ত্ব বলি। অন্য কোনও নামে এই বস্তু যথাযথভাবে ব্যক্ত হইতে পারিত না। এই তত্ত্বকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে পারিতাম না। কারণ ব্রহ্ম শব্দের একটা প্রাচীন ও প্রচলিত অর্থ আছে। সেই অর্থের সঙ্গে এই তত্ত্বের কোনও বিরোধ না থাকিলেও, তাহার দ্বারা ইহাকে পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না। ব্রহ্ম শব্দের একটা নূতন অর্থ করিতে পারা যায় বটে। কিন্তু সে অর্থ আপাততঃ লোকে বুঝিবে না। প্রত্যেক শব্দের পশ্চাতে এক একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস পড়িয়া আছে। সেই ইতিহাস-ধারাকে বদলাইতে বিস্তর সময়ের আবশ্যক হয়। দু'এক পুরুষে এটি হইবার নয়। এই চেষ্টা করিলে শব্দের প্রাচীন ইতিহাসের ভূত আসিয়া সর্ব্বদাই তার নূতন ঘরে উৎপাত আরম্ভ করে। নূতন ভাবকে বা অর্থকে ঠেলিয়া ফেলিয়া এই প্রবল ভূতটা সেই পুরাতন

ভাব ও অর্থকেই বারম্বার জাগাইয়া তুলে। ব্রহ্ম শব্দ মুখ্যভাবে উপনিষদেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সেখানে তার একটা বিশিষ্ট অর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মের কতকগুলি গুণ বা লক্ষণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই নির্ণীত হইয়া আছে। ব্রহ্ম বলিলেই এখন সেই সকল গুণ বা লক্ষণ আমাদের অন্তরে জাগিয়া উঠে। বিশেষতঃ এদেশের লোকে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার তত্ত্বই বুঝিয়া থাকে। সগুণ ব্রহ্মের কথাও আছে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকে এই সগুণ ব্রহ্ম বলিতে সাকার ব্রহ্মই বোঝে। বৈষ্ণবেরা নারায়ণকে সগুণ ব্রহ্ম বলেন। বৈদান্তিকেরা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝেন। এই ঈশ্বর পরব্রহ্ম নহেন। তিনি অপরব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, মায়াবিষ্ঠিত ব্রহ্মচৈতন্য। এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্বে অনেক কথা উঠে। সুতরাং শব্দের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, আমি যে বস্তুকে কৃষ্ণ-তত্ত্ব বলিয়া জানিয়াছি, তাহাকে ঠিক ব্রহ্মতত্ত্ব বলা যায় না। এই জন্যই ব্রহ্মতত্ত্ব কথাটা ব্যবহার করি নাই। ব্রহ্ম শব্দের প্রাচীন ইতিহাসের কিম্বা আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে, এই ব্রহ্ম-সাধনের মধ্যে এ বস্তুর সন্ধান পাই নাই। এই পথ অতিক্রম করিয়া তবে এই তত্ত্বের খোঁজ পাইয়াছি। তাই এ তত্ত্বকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে পারি না।

অন্যপক্ষে, পৌরাণিকী কৃষ্ণকথার ভিতর দিয়াই এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিয়া থাকি। ব্রহ্ম শব্দের পশ্চাতে যেমন একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, কৃষ্ণকথার পশ্চাতেও সেইরূপ একটা ইতিহাস আছে। ব্রহ্মজ্ঞানের একটা ধারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। আর কৃষ্ণ-ভজনার একটা ধারাও সেইরূপ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা কৈবল্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। মোক্ষই এ ধারার নিয়তি। কৃষ্ণ-ভজনার ধারা মুক্তি লক্ষ্য করিয়া চলে নাই। নিত্যকাল কেমন করিয়া ভগবানের সেবা করিতে পারিবে, ভক্তেরা

এখানে চিরদিন তাহাই খুঁজিয়াছেন। নির্ব্বাণ মুক্তি নহে, নিত্য-ভক্তিই এই ভজনার লক্ষ্য হইয়া আছে। ব্রহ্মের অন্তরালে জ্ঞান-মার্গের ইতিহাসটি লুকাইয়া আছে। কৃষ্ণের অন্তরালে এই অহে-তুকী নিত্য-ভক্তির সমগ্র ইতিহাসটি লুকাইয়া আছে। ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে ঐ জ্ঞানমার্গকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে এই ভক্তিপন্থাটিকে বিশেষভাবে দেখাইয়া দেয়। ব্রহ্মজ্ঞানেতেও ভক্তি মিশিয়াছে। জ্ঞানপথেও ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান বলিয়াছেন। আবার ভক্তিপথেও জ্ঞানের মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি ব্রহ্ম বলিলে জ্ঞানের ভাবই বেশি জাগিয়া [illegible] আর কৃষ্ণ বলিলে ভক্তির ভাবই বেশি উদ্দীপিত হয়। [illegible] আর কৃষ্ণতে প্রাচীন সাধনার ইতিহাসের দিক্ দিয়া এই [illegible] চিরদিনই রহিয়াছে। আর এই পার্থক্যটুকু আছে বলিয়াই, [illegible] যে তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি,—এখানে যাহার কথা কহিতেছি,— [illegible] পৌরাণিকী কিম্বদন্তীর কল্পিত কৃষ্ণকথা হইতে যতই পৃথক [illegible] না কেন, তাহাকে কোনও মতেই কৃষ্ণতত্ত্ব না বলিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব [illegible] সঙ্গত হইবে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শান্তি-স্বপ্ন

মন্দিরে, মঠে, তব পূজা হেরি, সে পূজা তোমার নয়—
আরতি, অর্ঘ্য, শঙ্খ, ঘণ্টা, দীপ, ধূপে অভিনয়!
আড়ম্বরের মত্ততামাঝে দেখিনাক অনুরক্তি,
তন্ত্র, মন্ত্র অর্থবিহীন, যদি নাহি থাকে ভক্তি!
তুমি চাহ, মাগো, হৃদয়ের পূজা, তুমি চাহ, মাগো, প্রীতি,—
বধির বিশ্বে কে শুনিবে আজ তব আহবানগীতি!

ক্ষমতা দর্প প্রবল বেগেতে খুঁজিছে নিজের পথ,
কুটিল স্বার্থ, বিরামবিহীন, সুখেতে চালায় রথ—
দুর্ব্বল যারা, অসহায় যারা, বুক ভেঙে দিয়ে যায়,
তোমার জগতে কতলোক কাঁদে, ফিরে পথে নিরুপায়!
মন্দিরে, মঠে, গির্জ্জায় তবু উঠে তব জয়-গান,
সেকি পূজা তব!—সে যে পরিহাস—দেবতার অপমান!

স্তব্ধ দাঁড়ায়ে মূক হিমাচল, আকাশ দেখিছে চাহি,
চরণে পড়িয়া রয়েছে বসুধা, জলধি উঠিছে গাহি!
কূজনে, গন্ধে, গুঞ্জনে, গানে, প্রকৃতির অধিকার,
জ্ঞানের গরিমা, মানের মহিমা, নাহি কোনো অবিচার!—
প্রকৃতির মহা পূজার দালানে বিরোধ ঠাঁই না পায়।
বিচিত্র সুরে এক মহাগান উঠে মহা-মহিমায়!

বিরোধ ঘুচায়ে দাঁড়াবে মানব হাতধরে' পাশাপাশি,
তব মুখপানে চাহিয়া বলিবে "মা, তোমারে ভালবাসি!"
তখন ভূতলে নামিবে স্বর্গ—কে খুঁজিবে অধিকার?
বিশ্ব-মানব মহাপ্রেমে হবে এক মহা-পরিবার!
সে দিন জগতে আসিবে শান্তি, পুণ্যপ্রভাতোদয়—
মানবজীবনে হইবে পূর্ণ তব ইচ্ছার জয়!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ

ভল্লুকের বুদ্ধি

স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের শিকার কাহিনী এদেশের অনেকেই পড়িয়াছেন। মহারাজের অকাল-প্রয়াণে তাঁর শিকার-কথা সকলগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সে কথা "নারায়ণে" শোভাও পাইবে না। কিন্তু মহারাজা বাহাদুর শিকারের কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে বন্য জীবজন্তুদের আশ্চর্য্য বুদ্ধির কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সময় সময় আমাদের বুদ্ধির অহঙ্কার খাট হইয়া গিয়াছে। সে সকল কথা মনে হইলে, নারায়ণ যে কেবল নরেরই সাক্ষী-চৈতন্য নহেন, কিন্তু সকল জীবেরই অন্তর্যামী, ইহার অনুভব অন্তরে জাগিয়া উঠে। তারই একটি কাহিনী আজ তাঁহার নিজের ভাষায় বলিব। মহারাজ বাহাদুর সেবারে মধুপুরের শিকার-কথা বলিতেছিলেন।

এখন আমি খুব পাকা শিকারী, খুব ওস্তাদ; এখন আর আমার লক্ষ্য একেবারেই ব্যর্থ হয় না। শিকারের স্পৃহাও বাড়িয়াছে। বৃদ্ধি পাইয়াছে। শূন্যে আকাশে পাখী উড়িয়া যায়,— —"পপাত ধরণীতলে"। পুকুরে লেজ তুলিয়া বড় বড় লট্ খেলে, আমার লক্ষ্যে তাহার লীলা-খেলা সম্বরণ শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, নদীতে ভোঁস্ করিয়া স, আমার অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহারও তিনটি জীব মৃত্যু-য়াছে। ইহাতেই আপনারা অবশ্যই বলিবেন, আমি রী। শিকারে আমার হাত বসিয়াছে।

জমকাল রকমের পার্টি সংগঠন করা হইল। সঙ্গে কজন বিস্তর; তাঁবু, রসদ ইত্যাদিও অবস্থা এবং কারী আমরা চারিজন মাত্র। সঙ্গে দুইটি ইংরাজ

বন্ধু, আর বাবু এবং খোদ স্বশরীরে বিদ্যমান আমি; শিকার-নির্দ্দেশের জন্য পাকা শিকারী খুজি মিঞাও এবার আমাদের সঙ্গে আছেন।

যেখানে আমাদের শিবির সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সে স্থানটী অতি মনোরম। চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল-ভূমি। শিবিরের সম্মুখ দিয়া কুলুকুলু নাদে একটি ঝরণা প্রবাহিত। অদূরে গভীর বনরাজী, বিজনতার প্রবীণ ছবি, বিদ্যমান। দিবা অবসান প্রায়, আমরা শিবির-সম্মুখে আরাম কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া, নানাবিধ গড্ড-লিকা-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি; এমন সময় খুজি মিঞা লম্বাহাতে কুর্ণিস্ করিয়া জানাইল,—আজ মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ণ, চিড়িয়া শিকা-রের একটা উৎকৃষ্ট দিন, শিকারও যথেষ্ট মিলিবে। সঙ্গে হলো নামে একটি সাহেব ছিলেন। তিনি তখনই সাগ্রহে গাত্রোত্থান করিলেন এবং চারককে বুট পরাইতে আদেশ করিলেন। দশ মিনিটের ভিতরে আমরা দুইজনে প্রস্তুত হইয়া পাওদলে চিড়িয়া শিকারে বাহির হই-লাম। সঙ্গে অপর লোকজন কেহ নাই—মাত্র একটি শিকার-বয় তল্পি তল্পা লইয়া পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। ঝরণা ধরিয়া কূলে কূলে খুজি মিঞার নির্দ্দেশ মতই আমরা সেই বিরাট বনভূমির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বিস্তর শিকার [illegible] পতিত হইতে লাগিল। সাহেব একটি বৃহৎ বন্য কুক্কু[illegible] চারিটি তিতোর মারিলেন। আমি বন্দুক স্পর্শও করিল[illegible] তির শোভা দেখিতে দেখিতে তন্ময়-হৃদয়ে বনানীর [illegible] অগ্রসর হইতে লাগিলাম,—দেখিলাম, কত বন্য লতিক[illegible] সজ্জিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ-কাণ্ড জড়াইয়া শাখা [illegible] বাহিয়া সোহাগে হেলিয়া দুলিয়া বাতাসে নৃত্য ক[illegible] মধুপ-কুল সেই কুসুম গন্ধে আকুল হইয়া চারিদিকে [illegible] মধুর ঝঙ্কারে বনভূমি মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। [illegible] ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

অদূরে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া মেঘগর্জ্জন হইল। আমরাও অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, সন্ধ্যারও বড় বেশী বিলম্ব নাই। দ্রুতপদে তাঁবুর দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। অগ্রসর হইতেছি; ক্রমে অগ্রসর হইতেছি; ক্রমে অগ্রসর;—পশ্চাৎ হইতে শিকার-বালক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হুজুর! ভাল্লুক! ভাল্লুক!" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, বিশ পঁচিশ হাত দূর হইতে এক ভীমকায় ভল্লুক আমাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভীষণনাদে বনভূমি আলোড়িত করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। শিকার-বালক আমার বন্দুকটি একটি গাছের নীচে ফেলিয়া এক লম্ফে গাছের উচ্চ ডালে চড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "হুজুর, এ গাছ ভাল, এই গাছে।" চাহিয়া দেখিলাম, গাছ ভাল বটে; কিন্তু আমাদের চড়িবার শক্তি নাই, সময়ও নাই; ভল্লুক একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ভয়ানক বিপদ! চিন্তার সময় নাই, একটানে উত্তপ্ত রুধির মাথায় উঠিয়া গেল। অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত, কর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বন্দুকটি তুলিয়া হাতে লইলাম, সাহেবের মুখের দিকে চাহিলাম,—মুখ রক্তবর্ণ, দৃষ্টি অপলক, স্থির হইয়াই আমার পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন, এক পাও নড়িতেছেন না, ঠিক যেন চিত্রার্পিত মূর্ত্তি। চিড়িয়া শিকারে বাহির হইয়াছি, বাঘ ভাল্লুক মারিবার সরঞ্জাম সঙ্গে নাই, মাত্র ছড়রার কার্টিজ—আমাদের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল তাও আবার শিকার-বয়ের স্কন্ধে ব্যাগের ভিতর, সেই গাছের উপরে। এমত অবস্থায় সাহেব ঘুরিয়া আমায় বলিলেন, "All right, there you are Maharaja". চাহিয়া দেখিলাম ঝরণার পাড়ে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, ঠিক তাহার এক রশী পশ্চাতে প্রাচীন অশ্বত্থমূলাবৃত একটি ভগ্ন মস্‌জিদ্। এক নিশ্বাসে উভয়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম; তাহার কোন দরজা কি কবাট কিছুই নাই, মাত্র প্রবেশের একটি ক্ষুদ্র দ্বার। দেখিলাম, তাহার এক কোণে কিছু শুষ্ক খড় পড়িয়া

আছে। ভল্লুক একেবারে আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, মস্‌জিদের তিন চার হাত অন্তর মাত্র। আমি বন্দুকের নলে কয়েকগাছা খড় তুলিয়া দুয়ারের সাম্‌নে স্থাপন করিলাম, সাহেব পকেট হইতে দিয়াশলাই-বাক্স বাহির করিয়া খড় ধরাইয়া দিলেন। আর প্রবেশের পথ নাই; চারিদিকে খিলানে আবদ্ধ, দুয়ারে আগুন; আমরা নিরাপদ। ভল্লুক কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং কট মট নেত্রে প্রজ্বলিত হুতাশনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল।

কে বলে পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী একেবারে জ্ঞানবিবর্জ্জিত, অনুধাবনাশূন্য? সূক্ষ্মভাবে পশু-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, অনেক সময় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে হইবে এবং বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিরহস্তের গূঢ়তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া স্তম্ভিত হইতে হইবে। কুকুর, ঘোড়া এবং হাতী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় আমরা অনেকেই পাঠ করিয়াছি। আমি জীবনের অধিকাংশ সময়ই জঙ্গলে জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাতে হিংস্র জন্তুর বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সে সব কাহিনী শুনিয়া আপনারা একান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। আজ এই ভল্লুকের আচরণে তাহার সামান্য আভাস মাত্র পাইয়াছিলাম।

মস্‌জিদের ভিতর হইতে আমরা উভয়েই স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ভল্লুকটা আস্তে আস্তে ঝরণার পারে গিয়া সচকিতে ক্ষণেকের তরে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এক লম্ফে ঝরণার জলে নিমজ্জিত হইল। দেখিতে না দেখিতে ভল্লুক সিক্তদেহে সেই মস্‌জিদের দ্বারে, যেখানে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল, ঠিক মানুষের মত দুই পায়ে দাঁড়াইয়া তাহার শরীর ঝাড়িয়া জল ছিট্‌কাইয়া আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিল। ভয় ভাঙ্গিয়া আমাদের বিস্ময় উপস্থিত হইল। এদিকে সাহেব বন্দুকের নল দিয়া অগ্নিতে খড় সংযোগ করিতে লাগিলেন।

দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ভল্লুক আবার লাফাইয়া ঝরণার জলে পড়িল। বিপদ কখন একা আসে না, তারও একটা সাথী চাই, এ কথা সত্য বটে। সাহেব তৃণগুচ্ছে পুনরায় যেমনি বন্ধুকের নল প্রবেশ করাইলেন, অমনি ফোঁস্ করিয়া এক প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ তৃণ হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া ফণা বিস্তার পূর্ব্বক আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। আমরা অনুপায়,—বাহিরে ভাল্লুক, দুয়ারে আগুন, ভিতরে সাপ! আমাদের অবস্থা যে তখন কি, তাহা কহিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই।

বিপদে যেমন ঐশী শক্তির অনুভূতি, সম্পদে সেরূপ হইলে এ সংসারই স্বর্গ হয়। অনন্যোপায় হইয়া উর্দ্ধনেত্রে বিপদবারণকে স্মরণ করিলাম। সর্প অবনত মস্তকে একটি গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, সাহেব বন্দুক লইয়া সর্পের দিকে অগ্রসর হইলেন, আমি ক্ষিপ্রকরে সাহেবকে বাধা দিয়া বলিলাম,—"সর্প যখন আমাদের বিপদ বুঝিয়া পথ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে, তখন আর উহার উপর জুলুম করিবার প্রয়োজন নাই।" সাহেব আমার মুখের দিকে চাহিয়া "Quite right" বলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম ধীরে ধীরে সর্পটি স্বশরীরে নির্ব্বিবাদে গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল।

জিঘাংসা লইয়া শিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাই বলিয়া যে, সকল অবস্থায় সকল সময় হিংস্রপ্রাণী দেখিবামাত্রই তাহাকে বধ করিব, কিম্বা বধ করিবার চেষ্টায় অগ্রসর হইব, সে উপাদানে গঠিত করিয়া ভগবান নিশ্চয়ই আমাকে এ সংসারে প্রেরণ করেন নাই। দীন দরিদ্রের সন্তান আমি,—এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল ছিলাম; এ রাজ-ঐশ্বর্য্য সম্ভোগের ভিতর বিধাতা আমায় টানিয়া লইলেন কেন? অবশ্যই তাঁহার কোন নিগূঢ়-রহস্য সৃষ্টি-রহস্যের গুপ্ত-আবরণে লুক্কায়িত আছে। মানুষ আমরা দেখিয়া শুনিয়া সব বুঝি,—বুঝিয়া আত্ম-গোপন করি, তাই দেবত্বে উন্নীত হইতে অসমর্থ।

আবার ভল্লুক আর্দ্র-দেহে প্রজ্বলিত আগুনের নিকটে আসিয়া,

দুই পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া জল ছিটাইয়া আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল ; এ দিকে সঞ্চিত তৃণগুচ্ছও নিঃশেষিত-প্রায়। সাহেব বন্দুকের নলে করিয়া আবার কিছু তৃণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন ; অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাতে আর একবার মাত্র চলিবে, ইহার পরেই চক্ষুস্থির !

হঠাৎ পকেটে হাত পড়িল, পাইপের সঙ্গে খট্ করিয়া কি বাজিয়া উঠিল, হাতে লইয়া দেখিলাম—চিড়িয়া শিকারের উপযুক্ত একটি কাট্রিজমাত্র। ভারবাহী তরণীর বিপন্ন নাবিক অনুকূল বাতাস পাইলে, অথবা বস্ত্রহীন শীতজর্জ্জরিত অশীতিপর বৃদ্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উন্মুক্ত মাঠের ভিতর একখানা কম্বল পাইলে যেমন প্রাণটা হাতে পায়, আমার অবস্থাও তখন ঠিক তাই হইল,—প্রাণে একটা বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইল। সাহেবকে আবার আগুনে অবশিষ্ট তৃণ-সংযোগ করিতে উপদেশ দিয়া, বন্দুকে কার্টিজ সংযোগ করিলাম। ভল্লুক দুই পায়ে ভর করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। আগুনও নিবিয়া আসিতেছে। তখন 'যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী' বলিয়া ঠিক ভল্লুকের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া গুড়ুম করিয়া আওয়াজ করিলাম। ভল্লুক এক পালট খাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে গভীর জঙ্গলের দিকে দৌড়াইয়া পলাইল। লক্ষ্য স্থির ছিল, ছড়রা নিশ্চয়ই ভল্লুকের চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছে। আমার উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

চার্ব্বাক-দর্শন।

চার্ব্বাক-দর্শন ভারতের ষড়্দর্শনের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, এক সময়ে যে ইহা কোনও কোনও লোকের মনে প্রভূত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, ষড়্দর্শনের আলোচনা হইতেই, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন অপরাপর দর্শনে চার্ব্বাকগণের মতের আলোচনা রহিয়াছে, ইঁহারা যখন চার্ব্বাকমত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন, তখন এ সকল সিদ্ধান্ত যে এককালে জনগণের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল, একথা বিলক্ষণ বুঝা যায়। অথচ কোথাও স্বতন্ত্রভাবে চার্ব্বাকমতের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়না। এইজন্য সকলের পূর্ব্বে এই চার্ব্বাকদর্শন কি, আমি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। পরে কি ভাবে প্রাচীন দার্শনিকগণ এই চার্ব্বাকমতের খণ্ডন করিয়াছেন, যথাসাধ্য তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

চার্ব্বাক-দর্শনের তাৎপর্য্য এই,—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য, পুনরাগমনং কুতঃ?"

পুরুষ যত কাল জীবিত থাকিবে, তাহার আর কার্য্যান্তর নাই; কেবল সুখান্বেষী হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবে। যখন সকল ব্যক্তিকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবেই এবং মরণের অব্যবহিত পরক্ষণেই পুত্রাদি বন্ধুগণ ঐ অস্পৃশ্য মৃত দেহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলে উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিতেছে না, তখন যাহাতে পুত্র-কলত্রসহ সুখে জীবন যাপন হয়, সেরূপ যত্ন করাই বিধেয়। এমন কি, ঋণ করিয়াও ঘৃতদুগ্ধাদি পান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইবে। দেহ ত ভস্মীভূত হইল, তাহার আবার পারলৌকিক আত্মা কোথায়? অদৃষ্ট, অনুকল্পিত, পারলৌকিক সুখলিপ্সায় ধর্ম্মোপার্জ্জনে আত্মাকে নিরতিশয় কষ্ট দেওয়া অতি মূঢ়ের কর্ম্ম!

চার্ব্বাকগণ বলেন,—

"অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যোমদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা নচাপরঃ।
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী॥"

ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি দ্রব্যের সম্মিলনে এই স্থূল, চেতনময় দেহের উৎপত্তি। যদিও ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতগণ প্রত্যেকে অচেতন, তথাপি তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে, তাহাতে চৈতন্য-গুণের আবির্ভাব হয়। যেমন হরিদ্রা পীতবর্ণ, চূর্ণ শুক্ল বর্ণ; কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে তাহাতে রক্তিমার জন্ম হয়; এবং গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেকে মাদক না হইলেও, ঐ সকল দ্রব্যের দ্বারা যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহাই মত্ততার কারণ হয়; সেইরূপ এই দেহ অচে-তন পদার্থসম্ভূত হইলেও, তাহাতে চিৎশক্তির বিকাশ অসম্ভব নহে। এই স্থূলচেতনময় দেহকে যদি আত্মা বলিতে হয় এবং তাহাই তোমাদের ইচ্ছা হয়, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, বাধাও নাই। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্যামবর্ণ—ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার আত্মাকে প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু স্থূলত্ব কৃশ-ত্বাদি ধর্ম্ম সচেতন ভৌতিক দেহেই লক্ষিত হয়। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে সচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই।

নাস্তিক্যমতাবলম্বী চার্ব্বাকগণ ন্যায়াদি-দর্শন-শাস্ত্র-স্বীকৃত প্রত্য-ক্ষাদি ছয়প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। ইঁহারা মাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন। যাহা দর্শনে, স্পর্শে, ঘ্রাণে, শ্রাবণে ও রাসনে অনুভূত হয়, তাহাই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য; অনুমান প্রভৃতির দ্বারা কখনও পদার্থের অস্তিত্ব প্রমিত হইতে পারে না। যদি আত্মা

বা পরলোক বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা অনুভূত হইত। আমরা অনুভবের বশবর্ত্তী, যেখানে অনুভব বিদ্যমান তাহাই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয়, তাহাই সৎস্বরূপে আদরণীয়। ইন্দ্রিয় যাহা অনুভব করিবে, তাহাই প্রমাণ, তদতিরিক্ত,—ইন্দ্রিয়ের অগোচর—কোন বস্তুসত্তা জগতে নাই।

আর্য্যমনীষিগণ, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়াও, বহু ধনব্যয় ও শারীরিক আয়াস স্বীকারকরতঃ বেদনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে অবশ্যই পরলোক থাকিবে, তাহা না হইলে, ঐসকল সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ, পরলোকের প্রত্যাশায় এরূপ যত্নস্বীকার ও কায়ক্লেশভোগ করিতে প্রয়াস পান কেন? তাঁহাদের সকল চেষ্টাই কি ব্যর্থ? চার্ব্বাকেরা বলেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? তবে যে তাঁহারা ঐসকল বেদোক্ত নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহার কারণ এই যে, কতিপয় প্রতারক ধূর্ত্তেরা বেদের সৃষ্টিকরতঃ তাহাতে পাপপুণ্য ও তাহার ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ও স্বর্গ-নরকাদি নানাপ্রকার বিস্ময়কর ও অলৌকিক পদার্থের বর্ণনা করিয়া সকলকে অন্ধ ও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের প্রত্যয়ের জন্য স্বয়ংও ঐ সকল মিথ্যাকল্পিত বেদবিধির অনুষ্ঠানকরতঃ জনসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে এবং কোটীশ্বর বদান্য নৃপতিবর্গের প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অজস্র ধনরাশি আত্মসাৎ করতঃ স্বীয় পরিবারবর্গপোষণ ও পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছে। তাহাদের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া পরবর্ত্তী প্রাকৃত জনসঙ্ঘও ঐ সকল অনুষ্ঠান করাতে বহুদিন হইতে ঐ সকল পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

বৃহস্পতির মত আশ্রয় করিয়া চার্ব্বাকগণ কহেন,—

"অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা সুখকল্পিতা॥"

অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দণ্ডধারণ, বিভূতিভূষণ প্রভৃতি বুদ্ধিপৌরুষহীন

ভণ্ডব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। ঐ সকল আড়ম্বরে বিষয়ী-ব্যক্তিদিগকে বশীভূত করিয়া কেবল ধনরাশি গ্রহণ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরীযাগ করিলে অচিরাৎ বৃষ্টি হয়, শ্যেনযাগে অরাতিকুল নির্ম্মূল হয়,—এই সকল বেদবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ অনেক ব্যক্তিই ঐসকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে, কিন্তু কোন ফলই দৃষ্ট হইতেছে না। আরও এক কথা,—এখন যাগ করিলে তাহার ফল কি বহুপরবর্ত্তী কালে ফলিতে পারে?

বেদে একস্থলে বিধি আছে,—"সূর্য্যোদয়ে হোম করিবে"; অন্য স্থলে দৃষ্ট হয়, "সূর্য্যোদয়ে হোম করিবে না"। এইরূপ বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধ অনেক স্থলেই আছে এবং উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় বহুবার এক কথার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। যখন এই সমস্ত দোষ সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে, তখন কি প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? অতএব স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা সবই মিথ্যা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম সবই নিষ্ফল, উন্নতির অন্তরায়, সুখভোগের কণ্টক। ফলতঃ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ক্রিয়াসকল অবোধ, অক্ষম ব্যক্তিগণের জীবনোপায় মাত্র।

আর ঐসকল ক্রিয়ানুষ্ঠাতা জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে নিরীহ ছাগাদি পশুর স্বর্গার্থে, তাহাকে বলি দিয়া মুক্তিমার্গে উন্নীত করিয়া থাকে, এই বা কি রীতি? যদি তাহা সত্যই হয়, তবে ঐ সকল ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকগণ, ঐ সকল যাগে বা মৃন্ময়ী প্রতিমার সমক্ষে স্বীয় পিতা মাতা প্রভৃতি আপ্ত বন্ধুবর্গের স্বর্গতির জন্য, তাহাদিগকে নিশিত খড়্গপ্রহারে ছেদন-করতঃ স্বর্গসুখের অধিকারী না করে কেন? তাহা হইলেই ত অনায়াসে তাহাদের স্বর্গলাভ হয়। পুনশ্চ, তাহাদের স্বর্গার্থে শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্টভোগ এবং ধনব্যয়ও করিতে হয় না। উহা ত কেবল ভণ্ডামি করিয়া প্রতারণার দ্বারা দাতার নিকট ধন গ্রহণের পন্থা।

শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে, তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাটীতে তাহার উদ্দেশে কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই ত তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে? পরন্তু অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি না হয় কেন? যাহাতে কিঞ্চিদুচ্চস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তাহাতে অত্যুচ্চ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? সুতরাং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা ভণ্ড ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র, বস্তুতঃ কোন ফলোপধায়ক নহে।

আর, যদি শরীর হইতে আত্মা পরলোক গমন করে এবং তাহার দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে ও স্নেহে ঐ দেহেই পুনর্ব্বার আসিয়া অবস্থান করে না কেন?

ভণ্ড, ধূর্ত্ত, ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক একত্র হইয়া বেদ রচনা করিয়াছে। অশ্বমেধযজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি বিষয় ভণ্ডকল্পিত, স্বর্গনরকাদির বিষয় সকল ধূর্ত্তরচিত, এবং যে সকল অংশে মদ্যমাংস নিবেদনাদির বিধি আছে, তাহা হিংস্র নিশাচরপ্রণীত। অতএব বেদ ও তদ্‌বোধিত পরলোক, আত্মা ও যাগাদি সবই মিথ্যা। বুদ্ধিমান্ পৌরুষসম্পন্ন ব্যক্তি, কোন মতেই তাহা বিশ্বাস করিবেন না, প্রত্যুত তাহাতে অবজ্ঞাপূর্ব্বক কর্ত্তব্যরত হইয়া সুখে সপুত্রকলত্রে জীবনযাপন করিবেন।

সুখের নামই স্বর্গ। ভোজনে পলান্ন; পরিধানে বহুমূল্য, উজ্জ্বল বসন; শয়নে বরাঙ্গনা;—ইহা ভিন্ন এই সংসারে, যাহা কিছু স্বাদু, সুগন্ধি, সুপেয়, সুষ্ঠু, তাহাই ভোগ্য, তাহার দ্বারা সমুৎপন্ন সুখই পরমপুরুষার্থ। যদিও এই সংসারে এই সকল সুখাস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার সহিত দুঃখও অবশ্যম্ভাবী, তথাপি ঐ দুঃখে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তত্তৎসুখসম্ভোগ করাই সকলের উচিত।

দেখ,—

"ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী" ॥

তুষাদি অসারাংশ সম্বলিত হইলেও কোন্ মহাজন পুষ্টিকর প্রাণপ্রদ ধান্য পরিত্যাগ করেন? কষ্টকর কণ্টক ও শল্কজালে জড়িত হইলেও কোন ব্যক্তি সুস্বাদু মৎস্যভক্ষণে পরাঙ্মুখ হন? পরন্তু সকলেই তুষকণ্টকাদি অসারাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সারাংশ গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন। কমল তুলিতে যাইলে কণ্টক-বেধন সহ্য করিতে হয়। পশুগণ কর্ত্তৃক শস্যাপচয় হইবে বলিয়া কি কেহ ধান্যবীজ বপন করিবেন না? না যাচকপ্রার্থনায় বিরক্তির ভয়ে কেহ অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করিবেন না? সুতরাং সুখানুষঙ্গী অবশ্যম্ভাবী দুঃখলেশে ভীত হইয়া সুখোপভোগে বিরত হওয়া অতি মূঢ়তার কার্য্য। সুখ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাই স্বর্গ। দুঃখই নরক। ইহলোকে কত দুঃসহ যন্ত্রণা অবিরত ভোগ হয়; তাহাই ত নরকের মূর্ত্তি। যিনি ইহলোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—রাজা, তিনিই পরমেশ্বর। তাঁহার উপর কে প্রভু? এই প্রত্যক্ষ দেহ উচ্ছেদ হইলেই মোক্ষপ্রাপ্তি। যতদিন দেহ থাকে ততদিনই বন্ধ; ততদিনই যন্ত্রণায় অধীর, সুখলিপ্সায় ব্যস্ত; ততদিনই গতাগতি। সুতরাং সকল সুখদুঃখের মূল এই দৃশ্যমান ভৌতিক শরীর। ইহার অপগমে কোন চেষ্টাই থাকে না, থাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মাই বা কি? পরলোক বা কোথায়? ইহাই নাস্তিকচূড়ামণি চার্ব্বাকের মত। আমাদের পূজ্যপাদ প্রাচীন দার্শনিকগণ কিরূপে এই চার্ব্বাক-মতের খণ্ডন করিয়াছেন, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীহরিপদ কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ।

সেকালের স্মৃতি—বাজে কথা

২। বঙ্কিমচন্দ্র।

আমাদের যৌবনে পিতামহ ভীষ্মকে My dear friend বলিবার অধিকার বা শ্রদ্ধাভাজনকে সাম্যের সমতলে টানিয়া আনিয়া সমকক্ষভাবে 'ভিজিট' দিবার রীতি ছিল না। এই জন্য একটা উপলক্ষ না জুটিলে বঙ্কিম বাবুর নিকট যাইতে পারিতাম না। প্রথম প্রথম মাসে একবার করিয়া সে সুযোগ ঘটিত। "সাহিত্য" বাহির হইলে বঙ্কিম বাবুর জন্য লইয়া যাইতাম। বঙ্কিম বাবু প্রথমেই লেখক ও লেখিকাদের নাম দেখিতেন। নূতন নাম দেখিলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন।

"সাহিত্যে" "বঙ্কিমচন্দ্র" শিরোনামে অনেকগুলি 'সনেট' ছাপা হইয়াছিল। কবি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের প্রায় প্রত্যেকের উপর এক একটি সনেট লিখিয়াছিলেন। সনেটগুলির নীচে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না। মলাটে নাম ছিল।

এক দিন অপরাহ্ণে বঙ্কিম বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তখন একটু প্রশ্রয় পাইয়াছি। সাহস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা করিতে যাই। বঙ্কিম বাবু সে দিন পূর্ব্বকথিত বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"এস, ভাল ত?" আমি প্রণাম করিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র আমার বেশ লাগিয়াছে। তুমি ত বেশ কবিতা লিখিতে পার। এ কথা ত আগে বল নাই।"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, আমি লিখি নাই।"

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "উহাতে নাম নাই দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম,—সম্পাদকের লেখা। না, তুমি লজ্জা করিতেছ?"

আমি সেই কবিতাগুলির লেখক হইলে বঙ্কিম বাবুর প্রশংসাটুকু আত্মসাৎ করিতে পারিতাম। সে সৌভাগ্য না হউক, আমি সনেট-গুলি বঙ্কিম বাবুর ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া একটু গর্ব্বের, একটু গৌর-বের সুখ ভোগ করিতেছিলাম। কারণ, যাঁহার লেখা, তাঁহার গৌরবে আমারও আনন্দিত হইবার কথা ছিল। প্রথম জীবনে পরিবারের বাহিরে আমরা যে বৃহত্তর পরিবারের রচনা করি, লেখিকা সেই পরিবারের এক জন ছিলেন, আমাকে দাদা বলিতেন।

বঙ্কিম বাবু আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে লিখিয়া-ছেন ?"

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, "পুঁটীর লেখা।"

বঙ্কিম বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পুঁটী ? পুঁটী কে ?"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, সরোজকুমারী দেবীর লেখা। বাড়ীতে পুঁটী বলিয়া ডাকে।—মুন্নির বোন।"

বঙ্কিম বাবু।—"ঘনশ্যামের মেয়ে ?"

আমি।—"না, মথুর বাবুর মেয়ে।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "মথুর বাবুর মেয়ে ? তুমি পুঁটী বলে, ডাকো। তা হলে তোমাদের চেয়ে ছোট ?"

আমি।—"আজ্ঞে হাঁ,—চৌদ্দ পনের বছরের বেশী বয়স নয়।"

বঙ্কিম বাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "বেশ ক্ষমতা আছে। রীতিমত চর্চ্চা রাখ্‌লে—ভবিষ্যতে ভাল হবে। তুমি তাকে বলো, আমার খুব ভাল লেগেছে।"

আমি আবার একটি 'আজ্ঞে' বাহির করিলাম। বঙ্কিমবাবু আবার বলিলেন, "আমার বইগুলি এত ভাল করে' পড়েছে; আমার উপ-ন্যাসের নায়ক নায়িকাদের নিয়ে এতগুলি কবিতা লিখেছে, এতে আমার আনন্দ হবে, এ কিছু বেশী কথা নয়। আমার নিজের কথা এমন করে' কেউ লিখ্‌লে, খারাপ হলেও হয় ত ভাল লাগ্‌তো। কি বল ? সে জন্য ত আমার আহ্লাদ হবেই। আর তা বল্‌তেই

বা দোষ কি? কিন্তু আমি সে কথা বল্‌ছি না। সত্যই এর কবিতা লেখবার ক্ষমতা আছে। কবিতাগুলি বেশ হয়েছে। তুমি তোমা-দের পুঁটীকে বলো, আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও।”

আমি বলিলাম, “বলিব। পুঁটী শুন্‌লে খুব খুসী হবে। সেদিন বিহারীবাবুও কবিতাগুলির প্রশংসা কচ্ছিলেন।”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “কোন্ বিহারীবাবু?”

আমি বলিলাম, “সারদা-মঙ্গলের বিহারী চক্রবর্ত্তী।”

বঙ্কিমবাবু। “তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে? তিনি কি করেন?”

আমি যাহা জানিতাম, বলিলাম। বিহারীবাবু পৌরোহিত্য করি-তেন। এ প্রশ্নের উত্তরে উহাই বলিতে হয়, তাই বলিয়াছিলাম। কিন্তু “সারদা-মঙ্গলে”র কবি, আমার মনে হয়, সংসারের কিছুই করিতেন না। তিনি করিতেন, সাহিত্যের পৌরোহিত্য! গুরুদেব হইবার রীতিমত বন্দোবস্ত ও সরঞ্জামও ছিল না; ধনী ছিলেন না,—অভাবও ছিল না; সৌভাগ্যক্রমে স্বল্পে সন্তুষ্ট ও তাঁহার গুরু বিদ্যা-সাগরের মত “স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল-কাঁটা” ছিলেন। যজমান প্রতিপালন করিয়া মঠ গড়িয়া ভক্তি শ্রদ্ধার ‘ব্যাপারে’র জন্য আড়তও করেন নাই। তাঁহার নিমতলার বাড়ীর নীচের ভাঙ্গা ঘরে দুই চারি জন যজমানের সমাগম হইত। তিনি সাহিত্যে মস্‌গুল হইয়া থাকিতেন। তাঁহার কাব্য-রসের যজমানের মধ্যে সে সময়ে প্রধান ছিলেন, সাহিত্য-রসিক প্রিয়-নাথ সেন ও কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তক্ত-পোষ বাজাইতেন। সে তক্তপোষে একখানা মাদুরও ছিল না। আর নিজের কথাবার্ত্তায়, আচারে, ব্যবহারে, মন্তব্যে “হোক গে এ বসুমতী যার খুসী তার” এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেন। বিহারীবাবু—বঙ্কিমবাবুর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিলেন না।—আমি মনে করিয়াছিলাম, বিহারীবাবুর কাছে যেমন বঙ্কিমবাবুর কথা শুনি, বঙ্কিম

বাবুর মুখেও হয় ত—তত উচ্চ গ্রামে না হউক—কিছু শুনিব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বিহারীবাবুর দুই একটি গল্প শুনিয়া বলিলেন, "জীবনেও Poet! ইহাকেই বলে কবি। খুব সদানন্দ লোক ত!"

আর একদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেদিন বঙ্কিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। একটি সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিলের সম্মুখে উত্তর দিকে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। টেবিলের অপর পার্শ্বে দুই তিনখানি চেয়ার, পশ্চিমে দুইটি আলমারী। উত্তর ও দক্ষিণের জানালা উন্মুক্ত। বঙ্কিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন। একটি ছোট গড়গড়া—তাহাতে দীর্ঘ কাঠের নল। দেখিলাম, সচরাচর লোকে নলের যে দিকটা গুড়গুড়িতে লাগায়, বঙ্কিমবাবু সেই দিকটায় তামাক খাইতেছেন; অপর দিকটা গড়গড়ার রন্ধ্রমুখে সন্নিবিষ্ট। আমি মনে করিলাম, বুঝি ভুলিয়া উল্টা দিকটা মুখে দিয়াছেন। কিন্তু পরে দেখিলাম, তাহা নয়। নলটা খুলিয়া টেবিলে রাখিলেন। আবার মুখে দিবার সময় দেখিয়া, উল্টা দিকটাই মুখে দিলেন। বঙ্কিমবাবুর টেবিলে চা'য়ের পেয়ালা ছিল। বঙ্কিমবাবু পেয়ালাটি তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চা খাবে?"

আমি বলিলাম, "থাক;—আপনার চা ত হইয়া গিয়াছে।—"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "খাও ত?—মুরলী!"

মুরলীধর হাজির হইল। বঙ্কিমবাবু আমার জন্য চা আনিতে বলিলেন।

মুরলী সেই বঙ্কিমবাবুর খানসামা।—প্রথম দর্শনেই যাহার সহিত আমার দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল। পরে তাহার সহিত আমার আপোষ হইয়া গিয়াছিল। মুরলীর সঙ্গে আমার একটু 'প্রেম'ও হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পর সে ভবানীপুরে উকীল হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল। মুরলী আর ইহলোকে নাই। বোধ হয় আবার বঙ্কিমবাবুর তামাক সাজিতেছে। যদি নরক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত ট্রাম হইয়া থাকে, এবং যমদূতকে সাধিয়া ছুটী পাই, তাহা হইলে বঙ্কিম-

বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার ইচ্ছা আছে। তখন মুরলী দ্বার ছাড়িয়া দিবে, হাসিমুখে 'আসুন' বলিবে, এবং লুকাইয়া তামাক সাজিয়া দিবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

কথায় কথায় ভাষার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি ত 'বঙ্গদর্শনে'র অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া দিয়াছি, বলিলেও চলে। আমরা যাহা লিখিতাম, তাহাই সুন্দর করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিতাম। এখন লেখকেরা এ দিকে বড় উদাসীন। তোমাদের 'সাহিত্যে'ও দেখি,—অনেক প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়, একটু অদল বদল করিলে, কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে বেশ হয়। কেন কর না? লেখকরা কি রাগ করেন?"

আমি বলিলাম, "আমরা পারি না; জানিও না। আপনা-আপনির লেখা দেখিয়াও দি। তাহার পরও ঐ রকম থাকিয়া যায়। সকলের লেখা কাটিতে সাহসও হয় না।"

বঙ্কিমবাবু।—"তাহা হইলে কেমন করিয়া কাজ চলিবে? এই জন্যই 'বঙ্গদর্শনে'র আমোলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া 'রিভাইজ' না করিয়া কাহারও কাপী প্রেসে দিতাম না। চন্দ্রনাথের শকুন্তলা দেখেছ ত; চন্দ্র একবারে বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজী লিখেছিলেন।—খুব খাটতে হয়েছিল। আমাদের সময়ে এ জন্য কেউ ত রাগ করতেন না।—তবু এখনও শকুন্তলায় ইংরেজী গন্ধ আছে।"

আমি বলিলাম, "আপনাদের আলাদা কথা।"

বঙ্কিমবাবু।—"ও কাজের কথা নয়। পরিশ্রমকে ভয় করিও না। এক খুব লিখিতে লিখিতে লেখা যায়। আর এক পরের লেখা কাটিয়াও নিজের লেখা পাকে। তা জান?"

আমি।—"আমরা পারিব কেন?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমরাও কর। আমি এক রাজকৃষ্ণ ছাড়া

কারও লেখা ভাল করে' না দেখে' প্রেসে দিই নি। রাজকৃষ্ণ বড় সুন্দর বাঙ্গলা লিখ্‌তেন। দিব্যি ঝর্‌ঝরে বাঙ্গলা।—জানতুম্‌, তাঁর লেখা প্রুফে একটু কেটে' কুটে' দিলেই যথেষ্ট হবে।"

"শকুন্তলা" বঙ্গবিশ্রুত সমালোচক ও মনীষী শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসুর "শকুন্তলা-তত্ত্ব"। বোধ হয়, না বলিলেও চলিত। কিন্তু এখনকার লেখকরা ও পাঠক-পাঠিকারা প্রাচীন গ্রন্থকারদের কোনও গ্রন্থই ত প্রায় পড়েন না। এই জন্য এখনকার সাহিত্যের সঙ্গে তখনকার—বিশ পঁচিশ বৎসরের সাহিত্যেরও যেন কোনও প্রাণের যোগ নাই। গত পুরুষের স্থপতিরা যে বনীয়াদ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আছে; তাহার উপর শৈবাল ও আগাছা জন্মিতেছে। এখন যাঁহারা গড়িতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই বালির উপর খেলা-ঘরের পত্তন করিতেছেন।

বঙ্কিমবাবুর রাজকৃষ্ণ স্বনামধন্য, বাঙ্গালার প্রথম ইতিহাসকার শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। রাজকৃষ্ণবাবুর ধীশক্তির, গবেষণার, রচনার, মধুর পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা তাঁহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি; দুই একবার সেই প্রতিভা-দীপ্ত উজ্জ্বল নয়নের কোণে দুই এক বিন্দু অশ্রুর উদ্গমও দেখিয়াছি। রাজকৃষ্ণবাবুর ক্ষুদ্র "বাঙ্গালার ইতিহাস" বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব। তাহাই আমাদের ইতিহাসের ভাণ্ডারে প্রথম "বিধি-দত্ত ধন"। তাঁহার "নানা প্রবন্ধ" বাঙ্গালী এখন পড়েন কি না, জানি না; কিন্তু আমরা এখনও পড়ি। রাজকৃষ্ণবাবুই প্রথমে বিদ্যাপতিকে সাহস করিয়া 'বাঙ্গালী' বলিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। রাজকৃষ্ণবাবু বিদ্যাপতির মিথিলাকে তখনকার বাঙ্গালার সামিল করিয়া মৈথিল কবিকে বাঙ্গালী বলিতেন। বঙ্কিমের পতাকামূলে স্বদেশের রত্নোদ্ধারের জন্য যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, রাজকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। আমরা যেন এই সকল পুণ্যশ্লোককে কখনও না ভুলি। বর্ত্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল, মনোরম, সন্দেহ

নাই। কিন্তু অতীতের অন্ধকারও পবিত্র। বর্ত্তমান অতীতকে আবরণ করিয়া যে যবনিকা বিস্তৃত করিতেছে, তাহার অন্তরালে আমাদের পূর্ব্বগামীদের যত্ন-সঞ্চিত রত্ন আছে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

এই দিন বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কি বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণের লিঙ্গ দেন? আপনার লেখায় কোথাও কোথাও এই রকম দেখিতে পাই, সর্ব্বত্র নয়।"

বঙ্কিমবাবু আপনার দক্ষিণ কর্ণে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"কান। আমার প্রমাণ—কান। যা কানে ভাল লাগে, তাই লিখি। অত নিয়ম মানিতে গেলে চলে না।"

আমরা আজকাল এই নিয়মেই চলিতেছি। সর্ব্বত্র কানই আমাদের অনেকের একমাত্র প্রমাণ বটে। কবিতায় ত কথাই নাই। তবে তাহা সঙ্গত হওয়া চাই। যাহা কানের জন্যই রচা হয়, কান পর্য্যন্তই যাহার গতি, কানেই যাহার স্থিতি, এবং কানেই যাহার চরম পরিণতি বা জীবন্মুক্তি, তাহা কান ভিন্ন প্রাণের অপেক্ষা করিবে না। তবে একটা কথা মনে রাখিলে মন্দ হয় না,—আমরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কান লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। আমাদের কান সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কানের অপেক্ষা একটু 'দীর্ঘ'। তবে হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞানও অবশ্য বিধাতা নিজের ওজনে দুনিয়ায় দান করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে, এই কয়টা কথা বলিবার জন্য এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না।

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

বিবসনা।

যমুনার নীল জলে গাহন করিতে রাই
ভাবেতে ভরল তনু, দেহে আর মন নাই!
কোথায় লুটিছে তার নীলাম্বরী কেবা জানে,
আলুথালু কেশপাশ, স্বপন-আবেশ প্রাণে।
নীল অঙ্গ বঁধুয়ার—নীল নীর যমুনার—
আলিঙ্গনে বাঁধিয়াছে নগ্নতনু বিভোরার।
ফেনিল তরঙ্গ যেন বাহুর বেষ্টনে তারে
জড়ায়ে রেখেছে সুখে সোহাগের সুধাগারে।
কভু বালা ঊর্ম্মি ঠেলি' বিমুক্ত হইতে চায়,
নিবিড় পরশ-পাশে নব ঊর্ম্মি বাঁধে তায়।
রসে ঢর ঢর কায়, চুম্বনে আকুল হিয়া,
বঁধুর অগাধ প্রেমে যায় বিশ্ব পাসরিয়া।
চেতনা ডুবিল প্রেমে, তিরোহিত বাহ্যজ্ঞান,
আঁখি বেয়ে পড়ে ধারা, করিছে বঁধুরে ধ্যান!

* * *

মরমের মর্ম্মতল আন্দোলিয়া অকস্মাৎ
কদম্বের শাখে বসি' বাঁশরী বাজা'ল নাথ।
জগৎ সরিয়া গেছে বালার নয়ন হ'তে,
কেবল বঁধুর প্রেম জাগিতেছে মনোপথে।
সহসা মরম মাঝে শুনিয়া মুরলী-ধ্বনি
প্রেম-উন্মাদিনী সম চমকি' উঠিল ধনী।
হিয়ার ভিতরে তার বঁধু কি বাজায় বাঁশী?
ইতি উতি চায় গোপী পরিয়া সুরের ফাঁসী।

চমকি', নয়ন তুলি' কদম্ব-তরুর পানে
চাহিয়া দেখিল—বঁধু পরাণ ঢালিছে গানে।
মুছে' গেল নদী, তরু ; নিভে' গেল নভ, রবি ;
মুগ্ধ নেত্র-পটে শুধু জাগিছে বঁধুর ছবি।
আপনা পাসরি' ধায় পাগলিনী নদী-তীরে,
মনে নাই নগ্নতনু, ধৌত হিয়া প্রেম-নীরে।

* * *

সকল ইন্দ্রিয় তার পুঞ্জীভূত দু'নয়নে,
কাঁপে বক্ষ থরথর, পয়োধর ভার গণে।
হৃদয়ের যত ভাব বঁধুরে ঘিরিয়া বয়,
বদনের যত বাণী শুধু "বঁধু-বঁধু" কয়।'
জগতের যত আলো কালো রূপে মিশে' যায়,
মরম চিরিয়া বালা বঁধুরে লুকা'তে চায়।
সে অপূর্ব্ব ভাব হেরি' মহাভাব উপজিল,
বঁধুয়া বাঁশরী ফেলি' প্রেম-নিধি বক্ষে নিল।—
সে নিবিড় আলিঙ্গনে চেতনা ফিরিয়া আসে,
লাজে রাই কমলিনী নয়ন মুদিল ত্রাসে।
জঘন চাপিয়া করে ভূমেতে পড়িল বসি'
চাহিল লুকা'তে যেন দীর্ণ ধরা-গর্ভে পশি'।—
আরে ছি ছি! পোড়া দেহ! কেন এ চেতনা-জ্বালা ?
বঁধুর চরণতলে কেন না মরিল বালা ?

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

ধোঁয়া

আমি খেয়ালী মানুষ, খেয়ালে চলি। আমার স্থিরতা নাই। যখন যে বস্তুতে আপনাকে পাই, তাহাকে ধরি ও ইচ্ছা হইলেই আবার তাহাকে ছাড়িয়া যাই। আমার নিত্য নূতন অভিরুচি। আমি যাহাকেই ধরি তাহাকেই গ্রাস করি। আর তখন তাহার জন্য আমার প্রাণের মায়া কাটিয়া যায়। তাই সেই বস্তুতে আর আমাতে কোন চিরসম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু "তুই" না হইলে আবার প্রাণ পাওয়া যায় না। যাহা একবার আমার জ্ঞানে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার ভিতর অজানা কিছু নাই, যাহার ভিতর আর কোন রহস্যের স্বাদ পাই না, তাহাতে আমার প্রাণের দোসর মিলে না, তাহাকে আমি "তুই" বলিয়া ধরিতে পারি না। যাহা পাইবার নয়, যাহা জানিবার নয়, তাহার প্রাপ্তির ও জ্ঞানের বাসনাই আমার ভোগের পথ, আর ভোগের শেষে জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ, তাই আমি নিত্য নূতন অজানার আশ্রয়ে আপনাকে অসীম করিয়া রাখি। আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বড়কে ভোগ করিতে গিয়াই বড় হইয়া উঠি। তাই এই ধরা ছাড়া, অজানাকে জানা, অসীমকে সসীম করিয়া তোলাই, আমার জীবন। ভোগেই জীবন পাওয়া যায়। ভোগই বৃদ্ধির কারণ।

আমি শুধু বস্তুতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হই না। আমি আগুনের মত তাহাকে বেড়িয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সেই বস্তুটিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলি। এই পোড়াইয়া ছাই করাই ত্যাগের পথ, সংহারের পালা।

আমার যেমন ভোগ ও ত্যাগে বৃদ্ধি, বিশ্বপ্রাণের বৃদ্ধিও তেমনি এই ভোগের ভিতর দিয়া। বিশ্বানল নিরন্তর বিশ্ববস্তুকে বেড়িয়া জ্বলিতেছে ও ভস্মসাৎ করিতেছে, আর সেই ভস্মেই নূতন স্বষ্টির বীজ। ভোগ-ত্যাগ-স্বষ্টি ইহাই বিশ্বাগুনের বিশ্ব লইয়া খেলা।

জগতে এই ভস্মাবশেষ হইতেই যত স্বষ্টি, এই ক্ষয় হইতেই যত বৃদ্ধি। জঙ্গল পুড়িয়া কি আবাদী জমি তৈয়ারী হয় না? প্রাণীদেহ পুড়িয়াই ত সার হয়। এই পোড়া না হইলে কৃষক জমিতে সার দিত কিসে? নবীন ধানের অঙ্কুর গজাইত কেমনে? আবার পোড়া মাটিতেই ঘরবাড়ী তৈয়ারী হয়। শুধু অন্ন নয়, শুধু আশ্রয় নয়, যত কলাসৌন্দর্য্যও এই পোড়া লইয়া। ভূগর্ভের তাপে পোড়া যে ধাতু ও শিলা, তাহাই ভাস্করমূর্ত্তির উপাদান। খনিজ কয়লার রূপান্তরই বর্ণ-কলার উপকরণ। তাই বলি দাহই সকল স্বষ্টির মূলে। শুধু আগুন ও ইন্ধনে চলে না। তাহাদের সমাবেশে যে ভস্মের উদয় হয় তাহাও আবশ্যক। সেই কারণেই বুঝি আগুন কখনও একেবারে নিবে না। কোথায় না কোথায় জ্বলে। আর এই অবিশ্রাম জ্বলার দরুণই জগতে ছাইয়ের রাশি এমন অমর অক্ষয়! হায়! তাই বুঝি আমার প্রাণের আগুনও বারে বারে ভিন্ন বস্তুকে বেড়িয়া জ্বলিতে চায়। তাই আজও আমার প্রাণের আগুন নির্ব্বাপিত হইল না। আমি জ্বলিয়া জ্বলিয়া এ কোন্ ভস্ম-স্তূপ গড়িয়া তুলিতেছি?

এই ভস্ম লইয়াই মানব-ইতিহাস। অতীতের পোড়া লইয়া বর্ত্ত-মানের কত স্বষ্টি, কত কৌশল! পুরাকালের ধ্বংসাবশেষে দেখি নূতনের উদয়। এই পোড়ামাটির উর্ব্বরতাগুণেই, এই ধ্বংসে নূতন স্বষ্টির বীজ থাকে বলিয়াই, একটি রোমের উপর আর একটি রোম, একটি দিল্লীর উপর আর একটি দিল্লী, যেন ধাপে ধাপে আকাশ পানে উঠিতেছে। তাই প্রতীচ্য ভূখণ্ডে রোম, ও প্রাচ্যে দিল্লী, Eternal City হইয়া রহিয়াছে। পুরাতন জয়স্তম্ভ, পুরাতন মন্দির,

ধোঁয়া

আমি খেয়ালী মানুষ, খেয়ালে চলি। আমার স্থিরতা নাই। যখন যে বস্তুতে আপনাকে পাই, তাহাকে ধরি ও ইচ্ছা হইলেই আবার তাহাকে ছাড়িয়া যাই। আমার নিত্য নূতন অভিরুচি। আমি যাহাকেই ধরি তাহাকেই গ্রাস করি। আর তখন তাহার জন্য আমার প্রাণের মায়া কাটিয়া যায়। তাই সেই বস্তুতে আর আমাতে কোন চিরসম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু "তুই" না হইলে আবার প্রাণ পাওয়া যায় না। যাহা একবার আমার জ্ঞানে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার ভিতর অজানা কিছু নাই, যাহার ভিতর আর কোন রহস্যের স্বাদ পাই না, তাহাতে আমার প্রাণের দোসর মিলে না, তাহাকে আমি "তুই" বলিয়া ধরিতে পারি না। যাহা পাইবার নয়, যাহা জানিবার নয়, তাহার প্রাপ্তির ও জ্ঞানের বাসনাই আমার ভোগের পথ, আর ভোগের শেষে জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ, তাই আমি নিত্য নূতন অজানার আশ্রয়ে আপনাকে অসীম করিয়া রাখি। আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বড়কে ভোগ করিতে গিয়াই বড় হইয়া উঠি। তাই এই ধরা ছাড়া, অজানাকে জানা, অসীমকে সসীম করিয়া তোলাই, আমার জীবন। ভোগেই জীবন পাওয়া যায়। ভোগই বৃদ্ধির কারণ।

আমি শুধু বস্তুতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হই না। আমি আগুনের মত তাহাকে বেড়িয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সেই বস্তুটিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলি। এই পোড়াইয়া ছাই করাই ত্যাগের পথ, সংহারের পালা।

আমার যেমন ভোগ ও ত্যাগে বৃদ্ধি, বিশ্বপ্রাণের বৃদ্ধিও তেমনি এই ভোগের ভিতর দিয়া। বিশ্বানল নিরন্তর বিশ্ববস্তুকে বেড়িয়া জ্বলিতেছে ও ভস্মসাৎ করিতেছে, আর সেই ভস্মেই নূতন সৃষ্টির বীজ। ভোগ-ত্যাগ-সৃষ্টি ইহাই বিশ্বাগুনের বিশ্ব লইয়া খেলা।

জগতে এই ভস্মাবশেষ হইতেই যত সৃষ্টি, এই ক্ষয় হইতেই যত বৃদ্ধি। জঙ্গল পুড়িয়া কি আবাদী জমি তৈয়ারী হয় না? প্রাণীদেহ পুড়িয়াই ত সার হয়। এই পোড়া না হইলে কৃষক জমিতে সার দিত কিসে? নবীন ধানের অঙ্কুর গজাইত কেমনে? আবার পোড়া মাটিতেই ঘরবাড়ী তৈয়ারী হয়। শুধু অন্ন নয়, শুধু আশ্রয় নয়, যত কলাসৌন্দর্য্যও এই পোড়া লইয়া। ভূগর্ভের তাপে পোড়া যে ধাতু ও শিলা, তাহাই ভাস্করমূর্ত্তির উপাদান। খনিজ কয়লার রূপান্তরই বর্ণ-কলার উপকরণ। তাই বলি দাহই সকল সৃষ্টির মূলে। শুধু আগুন ও ইন্ধনে চলে না। তাহাদের সমাবেশে যে ভস্মের উদয় হয় তাহাও আবশ্যক। সেই কারণেই বুঝি আগুন কখনও একেবারে নিবে না। কোথায় না কোথায় জ্বলে। আর এই অবিশ্রাম জ্বলার দরুণই জগতে ছাইয়ের রাশি এমন অমর অক্ষয়! হায়! তাই বুঝি আমার প্রাণের আগুনও বারে বারে ভিন্ন বস্তুকে বেড়িয়া জ্বলিতে চায়। তাই আজও আমার প্রাণের আগুন নির্ব্বাপিত হইল না। আমি জ্বলিয়া জ্বলিয়া এ কোন্ ভস্ম-স্তূপ গড়িয়া তুলিতেছি?

এই ভস্ম লইয়াই মানব-ইতিহাস। অতীতের পোড়া লইয়া বর্ত্তমানের কত সৃষ্টি, কত কৌশল! পুরাকালের ধ্বংসাবশেষে দেখি নূতনের উদয়। এই পোড়ামাটির উর্ব্বরতাগুণেই, এই ধ্বংসে নূতন সৃষ্টির বীজ থাকে বলিয়াই, একটি রোমের উপর আর একটি রোম, একটি দিল্লীর উপর আর একটি দিল্লী, যেন ধাপে ধাপে আকাশ পানে উঠিতেছে। তাই প্রতীচ্য ভূখণ্ডে রোম, ও প্রাচ্যে দিল্লী, Eternal City হইয়া রহিয়াছে। পুরাতন জয়স্তম্ভ, পুরাতন মন্দির,

ভাঙ্গিয়া পোড়াইয়াই কত কুতব মিনার, কত শাস্তা সোফিয়া (Santa Sophia) মস্‌জিদ্‌, কত শাস্তা মেরিয়া (Santa Maria) গির্জ্জা, নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। প্রাচীন (Coliseum) কলিসিয়মের ভগ্নস্তূপেই যে রোম নগরীতে কত নব্য হর্ম্ম্যাবলির মহল দরদালান স্তম্ভতোরণাদি গঠিত হইয়াছে! আর তাই বুঝি রোমের কলামূর্ত্তিতে আজও সেই (Coliseum) কলিসিয়মের শোণিত পিপাসা জ্বলিতেছে! বিলাসের উদ্যান, সেও শ্মশানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। দেখিয়াছি প্রাচীন বিলাস-ভবন (Pompeii) পম্পেয়ীর দগ্ধাবশেষে নবীন বিলাস-পত্তন (Naples) নেপল্‌সের রাজপ্রাসাদ সজ্জিত। কিন্তু এ অট্টালিকাও ধূলিসাৎ হইয়া, হয়ত একদিন ভেসুভিয়াসের ভস্মেই আচ্ছাদিত হইয়া, ভবিষ্যৎ বিলাসের বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। গ্রীসীয় ও রোমীয় ভাস্করগণ ভূগর্ভস্থ পোড়াধাতু ও শিলার দ্বারাই কত দেবমন্দির, কত নাট্যশালা, কত ডোরীয় ও করিন্থীয় স্তম্ভমালা, কত সৌম্য গম্ভীর বিরাট (Jupiter Olympus) জুপিটার ওলিম্পাস্‌, কত ভাস্বর বিবস্বান্‌ আপলো (Apollo), কত উর্ম্মি-উত্থিতা নগ্নস্নাতা আফ্রোডাইটি (Aphrodite) মূর্ত্তি রচনা করিল। কালে তাহা ভূমিসাৎ হইল, পুড়িয়া ছাই হইল, মাটির সঙ্গে মাটি হইল, ও কালে তাহাই পুনরুত্থিত হইয়া রেণেসাঁসে নূতন কলামূর্ত্তি ধারণ করিল। আবার সেই রেণেসাঁস্‌-প্রবর্ত্তিত শিল্পসাধনা আজ কি নূতন শিল্পের সূচনা করিয়া রাখিতেছে না? যুগযুগান্তর ধরিয়া কত জাতির পর জাতি, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, সাহিত্যের পর সাহিত্য, শিল্পের পর শিল্প, সভ্যতার পর সভ্যতা, একে একে ইতিহাসের আকাশে অস্ত যাইতেছে। আবার কি, নক্ষত্রের পর নক্ষত্রের ন্যায়, নূতন জাতি, নূতন সাম্রাজ্য, নূতন সভ্যতা, সেই আকাশে উদিত হইতেছে না? তাই ইতিহাসের প্রতিরূপ সেই (Arabia Felix) আরবের ফিনিক্স (Phœnix) ঐতিহাসিক আকাশে অস্তাচলের আগুনে আজ যে ভস্ম হইয়াছে, কাল আবার সেই ভস্মের আগুন হইতেই একটি

অরুণ নবজীবনের উদয় হইবে। না পুড়িলে নবজীবনের অভ্যুদয় নাই।

জড়জগতেও এক বিরাট আগুনের ক্রিয়া। নদী বহিতে বহিতে শুকাইয়া যায়, সাগর ভরিয়া উঠিতে উঠিতে স্থলে পরিণত হয়, পর্ব্বতশিলাও ক্ষয় হইয়া একদিন সমতল হইয়া পড়ে, আবার যে স্থান পূর্ব্বে সমতল ছিল, কালে সেখানে তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ শৈলশিখর দেখা যায়! এই যে পরিবর্ত্তন, এই যে ক্ষয়বৃদ্ধি, ইহাও এক আগুনের খেলা। সে আগুন কেবল পোড়াইয়া ছাই করে না, কিন্তু এক নূতন স্বষ্টির বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যায়। সেই বীজ হইতেই বসুমতী রত্নগর্ভা।

তাই বলি এই যে ভূগর্ভে স্তর রচনা, ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থলের সমাবেশ, এই যে জড়রাজ্যে ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে, ইহা তবে এক বিপুল অগ্নিকাণ্ড বই নয়। এ কোন্ দাবানল পার্থিব সকল বস্তুকে বেড়িয়া কখনও মিটি মিটি কখনও বা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে? আর এ জ্বালার ত শেষ দেখি না! ইহার আদি জানি না! ঐ যে আকাশে নীহারিকার উৎপত্তি কোন্ তাপের বলে? আবার কোন্ আগুনের ধক্‌ধক্ তাড়নায় সেই নীহারিকাই আকাশপথে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হইয়া নক্ষত্ররূপে যেন স্থির হইয়া যায়? আবার পাতালে দেখ, বসুন্ধরার হৃদয় কোন্ জ্বালার জ্বলনে আর না পারিয়া যেন মাটি ফাটিয়া জ্বলন্ত স্রোতে বহিয়া যায়? কোন্ আগুন জ্বালাইয়া পোড়াইয়া বসুন্ধরাকে রত্নগর্ভা করে?

সেই আগুনই কি উদ্ভিদ্-জগতে প্রাণরূপে জ্বলিতেছে না? তৃণ লতা বৃক্ষ, বীজ অঙ্কুর ফল, কি সেই প্রাণ-আগুনে জ্বলিয়াই কাঁচা পাকা বর্ণে রঞ্জিত নয়? শুধু সবুজ নয়, নানা বর্ণ নানা ভঙ্গিমায় প্রতিভাসিত হইতেছে। আগুনের লোলজিহ্বাতে যেমন নানা প্রকার বর্ণের অস্ফুট আভাস-রেখা দেখা যায়, সেইরূপ এই বসুন্ধরার দেহে,

শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে সেই তাপের উদ্ভাবনী শক্তিতে নানাবিধ বর্ণের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে। তাই আকাশে এমন নীলিমা, এমন ধবলিমা, এমন অনির্ব্বচনীয় রক্তিমা, আর তাই ধরণী-অঙ্গে কত সবুজ হলুদে গোলাপি লাল এমন রঙ্গাইয়া উঠিতেছে, কখনও কচিহরিৎ কখনও বা পাকা ধানের স্বর্ণপীত। কিন্তু হায়! থাকিয়া থাকিয়া কেন এ আগুন নিবিয়া যায়! তখন ত আর কোন রঙ্ দেখা যায় না। সব আঁধার হয়ে আসে! তখন সেই মায়াবিনী, দেহের উজ্জ্বলশ্রী তামস আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া, যেন ধরণীর গর্ভে আশ্রয় লন। তাই বলি যত রংএর মেলা, যত আলো আঁধার, সেই আগুনের প্রাণে।

শুধু বিরাট অগ্নিকাণ্ড নয়। প্রতি জীবে এক একটি আগুনের ফুল্‌কি। এই আগুনই দেহীর প্রাণ, জীবের চৈতন্য। হৃদয়-গহ্বরে ধক্ ধক্ করিয়া দহরাগ্নি জ্বলিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এ আগুনও দিগ্‌দিগন্ত ছাইয়া ফেলে।

পীঠস্থান ভেদে এ আগুন ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করে। সেমিরামিস্, আলেক্‌জন্দর, সার্লেমেন, নেপোলিয়নের হৃদয়ে এই আগুনের শিখাই বিজয়িনী-মূর্ত্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। অসংখ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জনপদ দগ্ধ করিয়াও সেই বিজয়িনী প্রতিমার লোল-জিহ্বার অনন্ত পিপাসা মিটিল না। তাই করালী আজ (Kaiser Wilhelm) কাইজের বিল্‌হেল্‌মের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিয়া দাবানলে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সাগরমন্থনে সমবেত সুরাসুরগণের সমক্ষে এই অগ্নিশিখাই মোহিনীর রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অগ্নিশিখাই রাবণের হৃদয়ে সীতা, পারিসের হৃদয়ে হেলেন, আণ্টনির প্রাণে ক্লিওপেট্রার রূপ। তাহাতেই লঙ্কা ও ট্রয় দগ্ধ, তাহাতেই রোমরাজ্য বিধ্বস্ত। ভিন্ন ভিন্ন পীঠস্থানে এই আগুনই কালী করালীরূপে জ্বলিয়া উঠে, কখনও শীত কখনও উষ্ণ, কখনও রক্ত কখনও কৃষ্ণ। ওফিলিয়াতে শীত,

আণ্টনিতে উষ্ণ, রোমিয়ো'য় রক্ত, ওথেলো'য় কৃষ্ণ। কে এই করালীর পীঠস্থান গণনা করিতে পারে!

এই আগুনই চিতার আগুন, শ্মশানে শ্মশানে জ্বলিয়া জ্বালাইয়া নিঃশেষ হয়। প্রাণ-বায়ু প্রাণময়ে, দেহ মাটিতে মিশায়, আর আগুন শূন্যে মিলাইয়া শূন্য হইয়া যায়। ইহাই শান্তিপথ, ইহাই শুদ্ধিমার্গ। প্রাণাগ্নিই একমাত্র পাবক। এই আগুনে পুড়িয়া যে ভস্ম হয়, তাহাই পূত, তাহাই শান্ত, তাহাই শিব।

এই যে দাবানল বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া নিরন্তর জ্বলিতেছে পুড়িতেছে পোড়াইতেছে, এই জ্বলাতেই বিশ্বপতির ভোগ ও ত্যাগ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি। এই আগুন কত ভাবে ভোগ করিতে জানে, কত ভাবে ভোগ করিয়া নিঃশেষ করে ও ভোগের পর ধোঁয়াতে পরিণত করে, তাহা কে বলিতে পারে? সেমেলি (Semele) যেমন দেবতেজে ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছিল, বিশ্ববধূও সেইরূপ বিশ্বপতি বৈশ্বানরের তেজে ভস্মসাৎ হয়। ইহাই বিশ্বপতির ভোগ, বিশ্বপতির ত্যাগ। ইহাই বৈশ্বানরের ইন্ধন লইয়া খেলা। ইহাই বৈশ্বানরের খেয়াল।

শুধু ইন্ধন ভস্মসাৎ হয় না, আগুনও নির্ব্বাপিত হয়। আগুন যখন জ্বলিয়া উঠে, তখন সে ইন্ধনকে আশ্রয় করিয়া জ্বলে ; কিন্তু জ্বলিতে জ্বলিতে যখন ইন্ধনটি নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন আগুনও নিবিয়া যায়, ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, আর সেই ধোঁয়া শূন্যে মিলাইয়া যায়। সব আগুনের পরিণাম এই ধোঁয়া। তবে ছোট আগুন ও বড় আগুন, সে কেবল ইন্ধনভেদে। যে যত বড় জিনিষকে বেড়িয়া জ্বলে, সে তত বড় আগুন। একটি দেশালাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিলে সেও একটি আগুন হইয়া উঠে, এবং সেই কাঠিটি নিঃশেষিত হইলে সেখানে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আবার যে আগুন একটি গ্রাম ব্যাপিয়া জ্বলে তাহার চরমেও সেই ধোঁয়া—আর সব ধোঁয়াই এক। কিন্তু এই যে জ্বলন, ইহাও কি সর্ব্বত্র এক?

আগুন জ্বলে পুড়ে ধোঁয়া হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র একেবারে নিবিয়া যায় না। আগুন জঙ্গম, তাই সে এক আধারে নেবে, কিন্তু নিবিবার আগে স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া যায়। তাই সে বারে বারে ভিন্ন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া জ্বলে। ইহাই আগুনের খেয়াল, ইহাই আগুনের ফুল্‌কি।

আমার খেয়ালও তাহাই। আমি যে সেই বিশাল অগ্নিরই একটি রূপ! তাই আগুন যেমন কখনও নিবিয়া যায় না, আমিও নিবিতে পারি না। তাই আমি অন্তহীন। তাই আমি অমর অজর। বারে বারে ভিন্ন বস্তুকে আশ্রয় করিতেছি, ও নিত্য পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ক্রমাগতই জ্বলিতে জ্বলিতে আপনার চৈতন্যকে বাড়াইয়া তুলিতেছি। বিশ্বাত্মার ভোগের শেষ নাই, তাই আমারও ভোগের শেষ নাই। বিশ্বানল যেমন এই বিশ্বগোলককে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে পুড়িতেছে ও অবশেষে তাহাকে ধোঁয়ায় পরিণত করিতেছে, এবং পুনরায় ধোঁয়ার ছায়া হইতে নূতন কায়া সৃজন করিয়া তাহাকে বেড়িয়া আবার ভোগ করিতেছে, আমিও তেমনি প্রতিবস্তুকে লইয়া কত ভাবে, কত রঙ্গে কত ভঙ্গে, ভোগ করি! এই জ্বলাই আমার ভোগের পথ।

আমার আগুনের যে আশ্রয়, সে আমার বিশ্ব, আমার গোলক। আমি সেই গোলকের অধিষ্ঠাত্রী। আমি এই গোলকটি অধিষ্ঠান করিয়া আমার প্রাণের আগুনে ইহার উপর কত ভিন্ন রংএর ভিন্ন ছবি অঙ্কিত করিতে থাকি। আমার খেয়াল—আগুনের খেলা—এই গোলকটি লইয়াই, ইহার বর্ণভঙ্গিমায়, ইহার রূপ-পরিবর্ত্তনে।

চাঁদের যেমন তিনটি রূপ, আমার গোলকেরও তাহাই। সূর্য্যের আলোক যখন যে ভাবে চাঁদের উপর পতিত হয়, চাঁদও আকাশে সেই ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে—কখনও পূর্ব্বমুখী কলায়, কখনও পূর্ণিমায়, কখনও পশ্চিমমুখী কলায়। আমার প্রাণের আগুনেরও তিনটি রূপ—গোম্‌রান, জ্বলা ও নেবা, আর এই তিন আগুনে

আমার বিশ্বগোলকও একে একে তিনটি রূপে আমার নিকট প্রকাশিত হয়। তাই আমি বিশ্ববস্তুকে তিনভাবে ভোগ করি। আমার ত্রিমূর্ত্তিতে ভোগ। তাই এই বিশ্বগোলকের অধিষ্ঠাত্রীও ত্রিমূর্ত্তি।

আমার আগুন জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বে কোথায় অবস্থান করে? সে কোন্ ইন্ধনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কণায় কণায়, প্রবেশ করিয়া গুমরাইতে থাকে? জানি না এমনই করিয়া কত দেশকাল যুগযুগান্তর ছায়ার মত ভাসিয়া গিয়াছিল। কোন্ নেবুলার রাজ্য হইতে আমার সেই বাষ্পীয় গোলক কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অবশেষে আমার গোলাধার হইয়া দাঁড়াইল! অকস্মাৎ দেখিলাম একটি গুহাস্থিত অগ্নিকুণ্ডের অন্তরে নিভৃতে আগুন গুমরাইতেছে, আর সেই চিরসঞ্চিত তিমির যেন পর্দ্দায় পর্দ্দায় অনাবৃত হইতে লাগিল। প্রাণের আগুন গুমরাইয়া গুমরাইয়া জ্বলিয়া উঠিলেও, ঘুম ভাঙ্গো ভাঙ্গো হইয়াও যেন ভাঙ্গিল না। সেই আধ আলো আধ আঁধারে, আধ ঘুম ঘোর আধ জাগরণে, দেখিলাম এক দিব্য মূর্ত্তি, আমার গোলকের অধিষ্ঠাত্রী প্রতিমা, শ্বেতপদ্মাসনা, বিবসনা। সেই যাদুকরী প্রতিমা যেন আমায় যাদু করিয়া লইল। তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে, উষার প্রথম আলোকে আমার গোলকটি দেখিয়া লইলাম। সে যেন এক ছবির রাজ্য—একখানি প্রকৃতি-পট। সে পট শুধু কালিমার আঁচড়ে অঙ্কিত নহে, নানাবর্ণের সংমিশ্রণেই অঙ্কিত, কিন্তু সপ্ত রঙ্ এখানে মিলাইয়া একটা উজ্জ্বল রসশ্রী আধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির অঙ্গে—তাহার বর্ণে রসে গন্ধে গীতে, যেন বিশ্ব-আগুন গুমরাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেই সপ্ত জিহ্বার সপ্ত রঙ্ পৃথক করিতে পারে নাই। সূর্য্যের কিরণ এই স্ফটিক গোলকে প্রতিফলিত না হইলে রঙ্ ফুটিবে কেমনে? এখনও যে কুয়াসার আবরণ, উষার ক্ষীণালোকে অস্ফুট লাবণ্যছায়ার তরঙ্গহিল্লোল, আকাশে মেঘমালা কোথাও কুণ্ডলাকৃতি, কোথাও বলয়িত, কোথাও ফেনপুঞ্জনিভ। সে গোলকে সকল প্রাণ, সকল পদার্থই, মোহা-

বেশে অভিভূত। সে যেন এক মায়াপুরী, পরীর রাজ্য। কোথাও

Fairies dance in fairy rings

In an elfish light on the emerald green!

কোথাও আরব্য-উপন্যাসের সেই অরুণ আলোকে মায়াবিনীর উদ্যান, সেই স্বর্ণালোকমণ্ডিত শুভ্র অট্টালিকা যেথায় কত প্রণয়ীর শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর মূর্ত্তি যাদুমন্ত্রে সংজ্ঞাহীন, কাহারও বা স্ফটিক মীন-পাত্রে স্বর্ণমীনমূর্ত্তি, আর সবাই যাদু হইতে মুক্ত হইবার মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আবার কোথাও সেই উপকথার রাক্ষস-পুরীতে কোন্ এক সূর্য্যাস্তের দেশে সপ্তমহল অট্টালিকার অন্তঃপুরে ফেন-শুভ্র-শয্যাশায়িতা সেই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা, সেই Sleeping Beauty, ও তাহার শয্যাপার্শ্বে সেই সোণার কাঠি রূপার কাঠি, সেই ঘুম ভাঙ্গাবার magic wand পড়িয়া আছে; কিন্তু "যুবরাজ" এখনও আসে নাই, তাই রাজকুমারীর ঘুম ভাঙে নাই। আবার অন্যদিকে দেখিলাম রম্য দেবভূমি। কন্দরে কন্দরে মুগ্ধ বনদেব-তার বিহার। দেখিলাম কোথাও নির্ম্মল প্রস্রবণে (Naiad) নাইয়া-ডের অবগাহন, কোথাও (Nymphs) নিম্ফ্‌সদের জলক্রীড়া, কোথাও বা (Fauns) ফন্‌সদের দ্রাক্ষারসপান ও নৃত্য। উপরে চাহিয়া দেখি রৌপ্যচাপহস্তা (Diana) ডায়ানা মুচকি হাসিয়া বঙ্কিমগ্রীবায় আকাশ-হরিণকে অনুধাবন করিতেছেন, আর নীচে আকাশতলে ধনধান্যভরা বসুন্ধরার প্রতিমূর্ত্তি (Demeter) ডিমীটার মাথায় এক আঁটি পাকা ধানের শীষ বহন করিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন।

এখানে নিত্য দো-আলো। এ দো-আলোয় ছায়া ও কায়ায় কোন ভেদ নাই। এখানকার চাঁদে চাঁদিনী আছে, কিন্তু প্রণয়ী-প্রণয়িনীর চোখ আজও অর্দ্ধনিমীলিত। এ সাগরেও তরণী ভাসমান, কিন্তু মাঝি নাই। বসুন্ধরার গর্ভে আছে রত্ন, কিন্তু মণিমালা দিয়া বিশ্বপতিকে বরণ করিয়া লইবে কে? বান ডাকিবার আগে যেমন গঙ্গাবক্ষ ফুলিয়া উঠে, এখানে নরনারীর প্রেমও তেমনি হৃদয়ে হৃদয়ে

কোঁপাইয়া উঠে, কিন্তু বন্যার ন্যায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া তটভূমি প্লাবিত করিয়া আজিও হুহুস্বরে বহিতে শিখে নাই। আর বাঁধ ভাঙ্গে নাই বলিয়া সে প্রেমে বিকার নাই, মায়া-বন্ধনও নাই। এ প্রণয়ে মান অভিমান, আশা নিরাশা, মিলন ও সংগ্রাম নাই। যেমন সংগ্রামের পূর্ব্বে কোন সম্রাট নিজ সাম্রাজ্যের সৈন্য ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে প্রস্তুত করিতে থাকেন, ইহাও ঠিক জীবনসংগ্রামের পূর্ব্বাবস্থা।

ইহাই আমার ছবির রাজ্য। কিন্তু এ ছবি, ও আমার নয়ন, যেন এক ফ্রেমে আঁটা। যত মূর্ত্তি, যত ছবি, যেন দেখিয়াও দেখি না। নয়ন চায় যত মূর্ত্তকে, যত সুন্দরকে, তাহার ফাঁদে বন্দী করিতে, কিন্তু কৈ কেহ ত ধরা দেয় না! বাঁধিতে চাই বাঁধা মানে না। আমি যেন দেখিতে দেখিতে ছবির সঙ্গে প্রকৃতি-পটে অঙ্কিত হইয়া যাই, সেই ছবির রংএ প্রাণের রং বিসর্জ্জন দিয়া যেন রংহীন হইয়া থাকি। এই ছবির সঙ্গে ছবি হওয়া আমার প্রথম ভোগ। ইহাই বিশ্বগোলকের আদিমূর্ত্তি।

দেখিতে দেখিতে আবার কত দেশকাল ভাসিয়া গেল,—অকস্মাৎ দেখিলাম সেই অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনটিকে বেড়িয়া আগুন দাউ দাউ করিয়া পুড়িতেছে। অমনি সেই আমার শান্তসুন্দর বিশ্বছবি যেন মুছিয়া গেল, সেই অস্ফুট ফিকে রঙ্ রক্তিম আভায় ঘোর হইয়া উঠিল, আর বৈশ্বানর যেন রণে মাতিয়া দিঙ্‌মণ্ডল দগ্ধ করিবার জন্য লোল-জিহ্বায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সমগ্র বিশ্ব যেন এক রণক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম আকাশের রক্তিম চক্ষে, ধরণীর নিঠুর বক্ষে, জীবনসংগ্রামের অভিনয় জাগিয়া উঠিয়াছে, আর দেখিলাম সেই বিশ্ব-মঞ্চের অভিনেত্রী, রমণীর দিগম্বরীমূর্ত্তি, লোলকটাক্ষা, রক্ত-পদ্মাসনা। সেই অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখা সেই মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া নিরন্তর লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আগুনের উত্তাপে প্রাণীমাত্র মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়াছে। যেন চিত্রপট হইতে শিল্পীর প্রাণ বাহির হইয়া আসিল। আর সে চিত্রের মধ্যে আপনাকে

মগ্ন রাখিতে রাজী নয়। প্রাণ আজ প্রকৃতিদর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া ক্ষান্ত নহে, আজ সে নিজে দর্পণ হইয়া সকল রঙ্‌, সকল বিম্ব, সকল ছায়া আপন অঙ্গে প্রতিফলিত দেখিতে চায়। সেই কুয়াসার প্রহেলিকাময় আবরণ আর নাই। সূর্য্যের প্রখর রশ্মি আমার স্ফটিক গোলকে এখন প্রতিফলিত। প্রকৃতিরূপসী আজ বর্ণে রসে গন্ধে গীতে সমুজ্জ্বলা, সুতীব্রা, মুখরা, উন্মাদনী। কিন্তু এই উজ্জ্বলরসশ্রীতে শান্তি নাই, এ যেন বহ্নির সহস্র জিহ্বা লেলিহ্য-মানা। ইহাই বাসনার রূপ, রূপের বাসনা। ইহাই ভোগাগ্নি।

সৈকতে দাঁড়াইয়া শুনিলাম সাগর অনন্তপিপাসা প্রাণে লইয়া পৃথ্বীর যত নদনদীকে আপন বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত কেবলই গর্জ্জন করিতেছে। পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম নীচে ধরণী-মাতা বহুসন্তানবতী জননীর ন্যায় সহস্র স্তন হইতে সহস্র ধারায় আপন সন্তানদিগকে পীযূষ পান করাইবার নিমিত্ত ক্রোড় পাতিয়া বসিয়া আছেন। আর দেখিলাম, উপরে মহাকাশ সকল ক্ষুদ্র আকাশকে, সকল খণ্ডশূন্যকে, মহাশূন্যে বেষ্টন করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান করিয়া আছে। চোখ বুজিয়া দেখি, অনাদ্যনন্ত মহাকাল সকল ক্ষণ পল দণ্ডকে আপন অ-কালে গাঁথিয়া লইবার নিমিত্ত শেষ মুহূর্ত্তের ধ্যানে মগ্ন। বুঝিলাম এ বিশ্বে সর্ব্বত্র এক জন অপরকে গ্রাস করিতে চায়, কিন্তু অপরে সেই করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হইবার জন্য সতত পরিধির বাহিরে ছটকাইয়া পড়িতেছে। তাই সাগরে প্রবিষ্ট হইলেও যত নদনদী, যত প্রস্রবণ, আবার বাষ্প-আকারে বাহির হইয়া আসে। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণ-মুহূর্ত্ত-পলগুলি সেই মহা-অকালের গ্রাস হইতে নিরন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া পলাইতে পলাইতে কাল ও অ-কালের গণ্ডীর সীমানা সৃজন করিতেছে। এ গোলকের এই নিয়ম। একবার এক হইতে বহুর দিকে, আবার বহু হইতে একের দিকে, আকর্ষণ বিকর্ষণ। একবার বিসর্গ একবার সংসর্গ। অগ্নিকুণ্ডে আগুন জলিতেছে ;—একটি প্রবাহের টানে সকল পদার্থ

কুণ্ডমুখে প্রবেশ করিতেছে, আর একটির উজানটানে কুণ্ডমুখ হইতে বাহির হইতেছে।

এ গোলক এক নিত্য মধ্যাহ্নের দেশ। আর সকল প্রাণই সেই মহান্ বিজয়ী সূর্য্যের এক একটি স্ফুলিঙ্গ,—ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। এখানে স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে রেষারেষি। ইহারা একজন আগুন একজন ইন্ধন নহে, পরস্পরেই পরস্পরের আগুন, তাই আগুনে আগুনে এই রেষারেষি কে কাহাকে ভস্মসাৎ করিতে পারে। কৈ পারিল কি?

কিন্তু ভোগাগ্নির চরমে কি শান্তি নাই? আছে আছে, এ মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন আছে,—আলো ও ছায়ার খেলা, এ নিদাঘের পর শরৎ আছে—রোদ ও মেঘের মেলা। রেষারেষির পর মেশামিশি। নবীনে নবীনে রেষারেষি, নবীনে প্রবীণে মেশামিশি। আগুন, সে প্রবীণ। ইন্ধন, সে নবীন।

আগুন যে চিরপুরাতন। কত যুগযুগান্তর ধরিয়া আগুন জ্বলিয়া আসিতেছে, তাহার উৎপত্তির নির্ণয় করিবে কে? আর ইন্ধন, তার যেন নিত্য নূতন রূপ, নিত্য নূতন বেশ। আগুন যে ইন্ধনকে চায়, সে প্রবীণের নবীনকে চাওয়া। ইন্ধন যে আগুনকে চায়, সে নবীনের প্রবীণকে চাওয়া। এই যে নবীনে প্রবীণে খেলা, ইহাই মানবজীবন। প্রবীণের প্রবীণতা হইল জগতের যত ইতিহাস, যত কাহিনী, যত জ্ঞানের সঞ্চয়; আর এই প্রবীণতায় তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়াই নবীনা অক্ষয় যৌবনা (Eos) ঈয়সের তৃষা মিটাইতে পারিবে। জানিয়া (Tithonus) টিথোনসের আত্মা অমর প্রবীণতা মাগিয়া লয়, চিরনবীনতা মাগে নাই! ঈয়সের বরদান, সে যে নবীনের প্রবীণ-প্রাপ্তির আশীষ। এই নবীণের সহিত কারবারেই প্রবীণের পুনর্জ্জন্ম, অক্ষয়বৃদ্ধি, চিরন্তন স্থিতি। নবীনই প্রবীণের প্রাণ, তাহার ভোগের সহায়, ক্ষুধার নিবৃত্তি। নবীনের নবীনতা, সে যে সদ্যোজাত পুষ্পের আসব। কিন্তু তাহা কি প্রাচীন বৃক্ষমূল হইতে রস টানিয়া ক্ষরিত হয় নাই? তাই নবীনের

প্রাণ হইল প্রাচীনকে নিয়তই লুণ্ঠন করায়, খণ্ডে খণ্ডে অংশে অংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবীণকে আপন নবীন শরীরে গাঁথিয়া লওয়ায়, আপনার নবীন রসে প্রবীণকে নবজীবনে লাভ করায়। তাই বসন্তের পুষ্প প্রাচীন বৃক্ষে নবীন মূর্ত্তির বিকাশ, তাই কত যুগের কঠিন শিলায় শৈবালের জন্ম, তাই স্তব্ধগম্ভীর হিমাদ্রিকণ্ঠে প্রস্রবণের কল-কলধ্বনি, তাই অগাধ চিরন্তন সাগরবক্ষে ফেনমালা! এ সকল নবীন মূর্ত্তিতে প্রাচীনের পরিচয়।

বুঝিলাম এ জগতে নারীমূর্ত্তিই চিরপ্রবীণা, তাই আজন্মকাল পুরুষ খণ্ডে খণ্ডে নারীশরীর বিলুণ্ঠন করিয়া, নারীর রক্ত শোষণ করিয়া, জগতে খণ্ডরসের সৃষ্টি করিতেছে। নবীনের প্রাণ এই খণ্ড-রসে। তাই প্রতি প্রাণী প্রতি বস্তুই নবীন, কেবল বসুন্ধরার মাতৃ-মূর্ত্তি যেন চিরপ্রবীণা। তাঁহার দেহে যত ইতিহাসের, যত সভ্যতার, যত সাহিত্যের, যত জ্ঞানের, পলি পড়িয়া আছে।

আবার কত দেশকাল ভাসিয়া গেল, অকস্মাৎ অগ্নিকুণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি ইন্ধনটি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন আমার বিশ্ব-গোলকের সেই রক্তিম আভা মিলাইয়া গিয়া যেন এক ধূসর আলো ছড়াইয়া পড়িল। আর সেই আলোকে দেখিলাম বিশ্বনারীর চিরপ্রবীণমূর্ত্তি, নীলাম্বরী, নীল-পদ্মাসনা। নীলাকাশের মত এই মাতৃমূর্ত্তি বিশ্ব-গোলককে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। ভূপৃষ্ঠে দেখিলাম যেন জলপ্লাবনের পর তট-ভূমিতে যুগান্তের পলি পড়িয়া গিয়াছে। সেই পলির উপর গাছের যত পাতা বিবর্ণ হইয়া নিরন্তর ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। যত পক্ব শুষ্ক ফল হইতে বীজ বাতাসে উড়িয়া মৃত্তিকা-গর্ভে আশ্রয় লইতেছে, আর বাদলা হাওয়ায় যত পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উত্তর দেশের নীড় ছাড়িয়া দক্ষিণাকাশ অভিমুখে উড়িয়া যাইতেছে। ক্রমে সেই ধূসর আলো ধূম্র হইতে ধূম্রতর হইতে লাগিল। দেখিলাম ছাইয়ের স্তূপ মাটিতে পড়িয়া, আর ধোঁয়া আকাশে উড়িয়া শূন্যে মিলাইতেছে। বুঝিলাম

ঐ যে বসুন্ধরার পলি, তাহা ভস্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। কত যুগযুগান্তরের—জন্মজন্মান্তরের আগুনের সেই ভস্মে পরিণতি। যত অতীতের অভ্যাস, যত পূর্ব্বস্মৃতি, যত খেয়াল, যত সংস্কার পুড়িয়া গলিয়া ছাই হইয়া বিশ্বে এই ভস্মের পলি সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে এই প্রাচীন পলি যাহাতে সৃষ্টির বীজ নিহিত; অপরদিকে ধোঁয়া, ভোগের শেষে জ্ঞান, যাহা চিরন্তন আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে। ইহাই আগুনের ভোগের পথ। এই ছাই ও ধোঁয়া, এক আগুনেরই দুই দিকে পরিণতি। একটি matter অপরটি spirit, একটি জড় অপরটি চিৎ, একটি স্বভাব অপরটি পরভাব, একটি রাগ অপরটি জ্ঞান। ছাই হইল ধোঁয়ারই কায়া, মূর্ত্ত-প্রকাশ, খণ্ড-প্রকাশ, আর ধোঁয়া হইল ছাইয়ের মুক্তাত্মা, যাহা চিদাকাশে উড়িয়া যাইতেছে। ভোগের শেষে যত হৃদয়ের ধক্‌ধকানি, যত পরাণের জ্বলনি-পোড়নি ক্ষান্ত হয়, যত যুক্তি বিচার সংশয়ের মীমাংসা হইয়া যায়, তখন আসে শান্তি, আসে মুক্তি, আসে জ্ঞান। তখন প্রাণের আগুন নিবিয়া ধোঁয়া হয়, আর ধোঁয়ার রাজ্য মহাকাশে মিলাইয়া যায়। অনাদি কাল হইতেই বিশ্বেন্ধন জ্বলিয়া পুড়িয়া মহাকাশকে এই ধোঁয়ায় আবৃত করিতেছে। দিনে দিনে যত ভোগান্তে অভিজ্ঞতা, যত বন্ধনান্তে মুক্তজ্ঞান, যত পাপবিদ্ধের অন্তিমে শুদ্ধিবোধ, যত ভ্রান্তের অন্তিমে সত্য আদর্শ, ভোগাগ্নির নির্ব্বাণে নিরন্তর আকাশ পানে উঠিতেছে, আর বিশ্বাদর্শের আকাশে সঞ্চিত হইয়া সেই আদর্শকে পূর্ণ করিতেছে, অজর অমর অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। তাই যজ্ঞাহুতি পুড়িয়া যে ধোঁয়া হয়, তাহাই দেবতার খাদ্য। তাই বৈদিক ঋষির হোমানলে যত ভোগের আহুতি। এই অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত না করিলে দেবগণের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত কেমনে? ধোঁয়া না হইলে আকাশে স্থান কোথায়!

এই যে শেষের ভোগ, ভোগের শেষ, ইহা ত দ্বন্দ্বে সম্পূর্ণ হয় না। শুধু আগুন ও ইন্ধনের সমাবেশে চলে না। এখানে তিনের

সংস্থান আছে। মাটিতে ছাই এক দিকে, শূন্য আকাশ অপর দিকে, আর এই সূক্ষ্ম ইন্ধনাগ্নি, এই ধোঁয়া, মাঝখানে। এই ধোঁয়াতেই মাটি ও আকাশের আদানপ্রদান। ইহাই জড় ও চিৎ-এর, ভোগ ও জ্ঞানের, বাস্তব ও আদর্শের, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের সন্ধিক্রম। তাই বলি ধোঁয়াই মধ্যবর্ত্তী।

শ্রীসরযূবালা দাসগুপ্তা।

পল্লী-মাঠে

পল্লীর শেষে গ্রামের কিনারে
চলিয়াছি পথ বাহিয়া,
উল্লাসে প্রাণ আকুল অধীর
পথপাশে দেখি চাহিয়া,—
ধান্যের ক্ষেত সবুজ শ্যামল,
রবির কিরণে উজল অমল,
চঞ্চল বায়ে অঞ্চলখানি
উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
শ্যামল মাঠের সবুজ সুষমা
পড়িছে ছাপিয়া ছাপিয়া।

গগনে ছুটেছে ধান্যের ক্ষেত
শ্যামঅঞ্চল উড়া'য়ে!
নিমেষে আমার অন্তরখানি
কেমনে গেল গো জুড়া'য়ে!
শস্যশীর্ষে অরুণ কিরণ
ধারে ধারে আজি করে বরিষণ!
বিধাতার শুভ আশীষ যেন রে
(তার) সারাদেহে গেছে ছড়া'য়ে!
ছুটেছে গগনে ধান্যের ক্ষেত
শ্যামঅঞ্চল উড়া'য়ে!

শ্রীগণেশচন্দ্র রায়।

বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মের দেববাদ ও দেবোপাসনা

আজকাল এ দেশের প্রায় সকল স্কুলেই হিন্দু-বালকেরা স্বল্পবিস্তর সমারোহ করিয়া সরস্বতীপূজা করে। আমার ছোট বালকটি যে স্কুলে পড়ে, সেখানেও এবারে খুব জাঁকাল রকমে পূজার আয়োজন হয়। সে অঞ্জলি দিতে যাইতে চাহিল। আমরা বহুদিন প্রতিমা-পূজা ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু এই বালক এ সকল তত্ত্বকথা ত জানে না ও বুঝে না। বৃদ্ধেরাই বা কয়জনে বুঝিয়া থাকেন? সে অঞ্জলি দিতে গেল না বটে। যায় নাই ভালই করিয়াছে, গেলে তার কুলধর্ম্ম রক্ষা হইত না। কিন্তু মনে মনে এজন্য একেবারেই যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহাও বলিতে পারি না। পরদিন পাড়ার এক প্রতিবেশীর প্রতিমা যখন বিসর্জ্জন করিবার জন্য লইয়া যায়, তখন আমার বালকটি এদিক ওদিক চাহিয়া, কেউ দেখিতেছে না ভাবিয়া, তাহাকে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল!

এ কি তার রক্তের দোষ? শিক্ষার দোষ যে নয়, একথা বলাই বাহুল্য। সে জন্মিয়া অবধি আমার বাড়ীতে কোন দেবদেবীর পূজা দেখে নাই। সে যাহা কিছু ধর্ম্মকথা শুনিয়াছে, সকলই এই প্রতিমা-পূজার বিরোধী। কিন্তু সেই নিরাকার তত্ত্ব সে বুঝে নাই। সে দোষ যদি কারও হয়, তবে তার কচি বয়সের। এই বয়সে এত "লজিক্" ও যুক্তিবাদ কা'রই হজম হয় না। মুসলমান্ বা খৃষ্টীয়ান্ হইলে, কৌলিক ও পৈত্রিক সংস্কার বশতঃ সে এগুলিকে বুতপরস্ত ও পাপ বলিয়া ভাবিতে পারিত। কিন্তু তার আপনার পরিবারে এ সকল প্রতিমাপূজা না হইলেও, অতি নিকট আত্মীয়েরা ঠাকুরদেবতার পূজা করেন, সে ইহাও জানে। কতবার তাঁহাদের

মুখে ঠাকুরদেবতার নাম শুনিয়াছে। কতবার তাঁহাদিগকে এ সকল প্রতিমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতে দেখিয়াছে। আমরা ছাড়া তার অপর গুরুজনেরা একেবারেই অজ্ঞ ও সর্ব্বদা অধর্ম্মাচরণে রত, আমাদের জন্য স্বর্গের অনন্ত উন্নতি আর তাঁদের জন্য নরকের অনন্ত দুর্গতির ব্যবস্থা হইবে;—এ সকল ধর্ম্মোপদেশ সে পায় নাই। এ অবস্থায় চারিপাশে তার আত্মীয়স্বজনেরা, পাড়াপ্রতিবেশীরা, খেলার সাথী ও বিদ্যালয়ের সতীর্থেরা যে দেবদেবীর প্রত্যক্ষ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি মহম্মদীয় বা খৃষ্টীয়-প্রকৃতি-সুলভ অশ্রদ্ধা তার হইতেই পারে না। সরস্বতী কে, সে বুঝে না। যাঁহারা এত ধুমধাম করিয়া বৎসর বৎসর এই দেবতার পূজা-অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই সকলে বুঝেন কি? নিরাকার ব্রহ্মবস্তু যে কি, ইহাও সে জানে না। যাঁহারা নিয়ত এই ব্রহ্মের বাঙ্ময়ী উপাসনা বা মানস-কল্পনা রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বা কয়জনে এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝেন? এই প্রত্যক্ষ সরস্বতী তার বাল্যকল্পনাকে বরং কিয়ৎ পরিমাণে জাগাইতে পারে, ঐ নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাও পারে না। এ অবস্থায় সে যে আমার ঘরে জন্মিয়াও চোরের মতন ঐ সরস্বতীকে প্রণাম করিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ভাবিতেছি, এ প্রণামের অর্থটা কি? আমি দেবদেবীকে প্রণাম করিতে শিখিয়াছিলাম। মা বাবা শিখাইয়াছিলেন। পরিবারের সকলে ইহাদিগকে প্রণাম করেন, দেখিয়াও শিখিয়াছিলাম। শেষে একদিন প্রণাম করিতে চাহিলাম না, বলিলাম—এ যে পুত্তলিকা, ইহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করি কেমন করিয়া? সে দিন যে গোল বাধিয়াছিল, তার জের এই চল্লিশ বৎসরেও মিটে নাই। কিন্তু এ বালককে ত এই প্রণাম কেউ শিখায় নাই। সে এমন করিয়া, ভাই ভগ্নীদের উপহাসের ভয়ে, লুকাইয়া প্রণাম করিতে গেল কেন? কেন, আমি তার কি বুঝি? সেও বলিতে পারিবে কি না সন্দেহ। এই লইয়া তার সঙ্গে একটা বিচারেও ত বসিতে পারি না।

তবে সরস্বতীর সঙ্গে লেখাপড়ার একটা কিছু সম্পর্ক যে আছে, এ কথাটা সে অবশ্যই জানে। নহিলে স্কুলে আর কোনও ঠাকুর-দেবতার পূজা হয় না, কেবল সরস্বতীরই হয় কেন? সরস্বতী বিদ্যা-দাত্রী, তাঁর পূজা করিলে বিদ্যালাভ হয়, ইহা সে শুনিয়াছে। আর এই বিদ্যালাভের জন্যই, মনে হয়, সে অমন করিয়া সরস্বতীকে প্রণাম করিল। অপর একটি বালক, তার পিতামাতাও আমাদেরই মতন, তাঁদের বাড়ীতেও কোনও দিন কোনও প্রকারের প্রতিমার বা দেব-দেবীর পূজা হয় না, সেও সরস্বতীপূজার পূর্ব্বদিন তার মাকে বলি-য়াছিল,—"মা আমি সরস্বতীকে অঞ্জলি দিতে যাইব, আর আমার এল্-জাব্রাখানা তাঁর পায়ের কাছে রাখিয়া দিব। তা'হলে আর ওখানা পড়্‌তে হবে না, সব বিদ্যা আপনি জন্মিবে।" এ বালক আমার বালক অপেক্ষা বয়সে বড়। লেখাপড়াও বেশী করে। কথাটা সে কতকটা তামাসা করিয়াই বলিয়াছিল। অন্ততঃ আমরা সেটাকে তামাসা বলিয়াই ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু সে তামাসা করিয়াই বলুক আর না বলুক, তার কথার ভিতরে এই সকল দেবদেবীপূজার একটা দিক্ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সে এল্‌জাব্রা পড়িতে চাহে না। এল্‌জাব্রা পড়া তার রোচে না। এত ক্লেশ করিয়া যথারীতি সে এ বিদ্যালাভ করিতে রাজী নহে। অথচ এল্‌জাব্রা না পড়িয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাও পাশ করা যায় না। সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দিয়া যদি কোনও প্রকারে এল্‌জাব্রা পড়ার ক্লেশ স্বীকার না করিয়াও এল্‌জাব্রার পরীক্ষাটা পাশ হওয়া যায়, সে ত বেশ কথা। প্রাচীনকালে যারা বৈদিক যজ্ঞাদি করিত, তারাও কতকটা এই ভাবেই সে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে করিত। যাদুকর যেমন আপনার যাদুগুণে মাটিকে সোনা করে, একটা বীজ মুহূর্ত্তের মধ্যে পুতিয়া তাহাতে ফল ধরায় ও সেই ফল পাকাইয়া অকালে লোককে খাইতে দেয়,—এই সকল যজ্ঞকর্ম্মদ্বারা সেইরূপ কোনও অলৌকিক ইন্দ্রজালপ্রভাবে পরলোকে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়, কিম্বা এই

লোকেই রূপ, ধন, পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ এবং শত্রু জয় হয়। এই বিশ্বাসেই লোকে নানাবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত। ক্রমে এ সকল বৈদিক যাগযজ্ঞের এই ঐন্দ্রজালিক ভাবটা এতই প্রবল হইয়া উঠিল, যে যাজ্ঞিক মীমাংসকেরা বেদের ইন্দ্রাদি দেবতাকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিলেন। জৈমিনি মুনি স্বয়ং ইহা করিয়াছেন। আর জৈমিনির যুক্তির নিকটে আধুনিক ইহসর্ব্বস্ব, প্রত্যক্ষপ্রধান ইউরোপীয় যুক্তিবাদ পর্য্যন্ত হার মানিয়া যায়। জৈমিনি বলেন যে ইন্দ্রনামে যদি সত্যই কোনও দেবতা থাকেন, যিনি ঐরাবতে চড়িয়া যজমানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যজমান যে মৃৎ-ঘট স্থাপনা করিয়া "ইহাগচ্ছ" "ইহতিষ্ঠ"—বলিয়া এই ইন্দ্রদেবতাকে আহ্বান করে, তিনি অবশ্যই সেই ঘটের উপরে আসিয়া বসেন। যদি তাই হয়, তবে ঘট ত একেবারে চূর্ণ হইয়াই যাইবে। ঘট যখন ভাঙ্গে না, তখন বলিতে হয় যে ডাকিলেও ইন্দ্র আসেন না, আর না হয়, ইন্দ্রনামে কোনও দেবতাই নাই। ডাকিলে আসেন না, একথা মানিলে, বেদমন্ত্র নিরর্থক হইয়া যায়। বেদ কখনও নিরর্থক হইতে পারে না, কারণ বেদ অপৌরুষেয়, আপ্তবাক্য, অভ্রান্ত। সুতরাং ইন্দ্রনামে কোনও দেবতা নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। বৈদিক মন্ত্রে যে ইন্দ্রদেবতার কথা আছে, তাহা কোন বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করে না, যথাবিধি উচ্চারিত হইলে, নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞফল উৎপাদন করে মাত্র। এই ভাবে জৈমিনি যজ্ঞের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া, ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ব্যতীত, কেবল কোনও মন্ত্রাদির প্রভাবে যেখানে কোনও বিশিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, সেখানেই আমরা এই ক্রিয়াকে ইন্দ্রজাল বলি। বৈদিক যাগযজ্ঞের এই ঐন্দ্রজালিক ভাবটা খুবই প্রবল ছিল। আর আমাদের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডেতেও স্বল্পবিস্তর এই ঐন্দ্রজালিক ভাবটা আছে। সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দিলে, পড়াশুনা না করিয়াও, কেবল তাঁহারই বরে,

আকাশ-ফোঁড়া বিদ্যা লাভ হয়। তাঁর পায়ে এল্‌জাব্রা নিবেদন করিলে, রাত্রে বিছানায় শুইয়াই হয় ত প্রাক্তনজন্ম বিদ্যার মতন, বীজগণিতের সকলপ্রকারের কঠিন আঁক কষিবার শক্তিটা আপনা-আপনি পাওয়া যায়। এইভাবে যে অনেক লোকেই, বিশেষতঃ বহুতর স্কুলের বালকেরা, এমন উৎসাহ করিয়া, এতটা ভক্তিভরে এই বাগ্‌দেবতার পূজা করে না, এই কথা বলা যায় না। এই সকল পূজা-অর্চ্চনার এই ঐন্দ্রজালিক প্রভাবটাই সত্য সত্য অনিষ্টকর। ইহাতেই মানুষকে অমানুষ করিয়া ফেলে।

ইন্দ্রজালপ্রভাবে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সম্বন্ধে মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের কোনও অবসরই থাকে না। এখানে অন্ধ আনুগত্যই সফলতালাভের একমাত্র উপায়। আর এই জন্যই ঐন্দ্র-জালিক ধর্ম্মাচরণে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিস্তেজ, তার জ্ঞানান্বেষ-ণের স্পৃহাকে পঙ্গু এবং পুরুষকারকে ম্রিয়মাণ করিয়া তোলে। আত্ম-চেষ্টায় যেখানে কোনও কিছু পাওয়া যায় না, যন্ত্রারূঢ়ের মতন কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপ করিয়াই যেখানে ঈপ্সিত ফল লাভ হইতে পারে, সেখানে সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে না। ইন্দ্রজাল কেবল তামসিক লোকের তমকেই বাড়াইয়া দিতে পারে। ঐন্দ্রজালিক যাগযজ্ঞাদিতে প্রাচীনকালে ইহাই করিয়া-ছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের এই অতিপ্রাকৃত ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই সত্য সত্য অনিষ্টকর। ভগবান্‌ বৌদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা রামমোহন পর্য্যন্ত সকলে হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ডের এই ঐন্দ্রজালিক দিক্‌টার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত দেবোপাসনার একটা ঐন্দ্রজালিক দিক্‌ যেমন আছে, সেইরূপ একটা রসের এবং কাব্যের দিক্‌ও আছে। ঐ ঐন্দ্রজালিক দিক্‌ দিয়া দেখিলে, এগুলিকে প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞেরই জের বলিতে পারা যায়। এই রসের ও কাব্যের দিক্‌ দিয়া দেখিলে, এগুলিকে পৌরাণিকী রূপ-কথার বাহিরের অভিব্যক্তি।

বা প্রত্যক্ষ অভিনয়-চিত্র বলা যাইতে পারে। আর ঐ ঐন্দ্রজালিক দিক্‌টা যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, এ সকল ক্রিয়াকাণ্ডের এই রসের ও কাব্যের দিক্‌টা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। এই পৌরাণিকী দিক্‌টা সকল উন্নত ধর্ম্মেতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও বা বেশী কোথাও বা কম। আর এই পৌরাণিকী কল্পনার সঙ্গে সর্ব্বত্রই ভক্তি সাধনেরও অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমাদের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের ঐ ঐন্দ্রজালিক দিক্‌টা নষ্ট করিতেই হইবে। না করিলে ধর্ম্মের সত্য মর্ম্ম এবং সাধনের সঞ্জীবনী শক্তি কোনও দিনই ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু এই সকল পূজা-অর্চ্চনার বাহ্য ও অলীক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব নষ্ট করিতে যাইয়া, উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা ও রূপক-রূপে, এই সকল দেবদেবীর কল্পনা আমাদের দেশের ভক্তিসাধনের ধারাকে আশ্রয় করিয়াই যে ক্রমে ক্রমে সাধক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এই কথাটাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আমরা এই যুগে, বালক-বৃদ্ধ কিম্বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে সকলেই যে এই সকল পুরাতন পৌরাণিকী রূপকের আশ্রয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন করিতে পারিব, এমনটাও বলা যায় না। কিন্তু কাহারই পক্ষে এগুলি ভক্তিসাধনের সহায় হইতে পারে না, এমন কথাই বা বলিতে পারি কি? কেহ কেহ যে এইগুলিকে ধরিয়া ভক্তিলাভ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, ইহাও ত অস্বীকার করা অসম্ভব। এই জন্যই কালাপাহাড়ের মতন এগুলিকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া দিতে চাহি না; চাহিলেও ভাঙ্গিতে চূরিতে পারিব না। অন্য পক্ষে এগুলি যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, সেই ভাবেই চলিয়া গেলে, তাহাদের দ্বারা বর্ত্তমানের ভক্তিসাধন কখনওই কোনও প্রকারে পরিপুষ্টি লাভ করিবে না। আমাদের সমক্ষে নূতন নূতন সমস্যা ও নূতন নূতন আদর্শসকল জাগিয়া উঠিতেছে। এই নূতন ভাবের সঙ্গে ঐ সকল পুরাতন পৌরাণিকী কল্পনার সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। এই জন্য

সরাসরি ভাবে এগুলিকে অসত্য বলিয়া বর্জ্জন করিলে চলিবে না, কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে ও সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া, এ সকলকে যথাসম্ভব সার্থক ও সজীব করাই প্রয়োজন।

এদেশের সাধনাকে যাঁহারা বড় করিয়া তুলিতে চাহেন, আপনাদের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্মসম্পদভাণ্ডার এবং নিজেদের জাতির বৈশিষ্টকে রক্ষা করিয়া, যাঁহারা এ সকলকে আধুনিক কালের উচ্চতম শিক্ষা ও সাধনার সঙ্গে যথাযথ ভাবে মিলাইয়া, বিশ্ব-সাধনার সনাতন পূত ধারাকে পরিপুষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই যুগ-সমস্যার সমন্বয় সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। বিরোধের ও প্রতিবাদের পূর্ব্বপ্রয়োজন এখন আর নাই। ভাঙ্গার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে ; এখন গড়িতে আরম্ভ করা আবশ্যক। আর এই গড়া নিতান্ত পরানুচিকীর্ষাপর অথবা একান্ত মনগড়া হইলেও চলিবে না। ইহাকে নিজেদের বৈশিষ্টের উপরে, বস্তুতন্ত্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পূর্ব্বাপরের সঙ্গে প্রাণগত যোগ রাখিয়া, আমাদের জাতির জীবনের মূলসূত্র ও চিরন্তন লক্ষ্যকে ধরিয়াই এই নূতন গড়ার কাজটা করিতে হইবে। আমাদেরই ছাঁচে আমরা যেমন যুগে যুগে নব নব আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছি, এই যুগেও তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। বিলাত বা আমেরিকা হইতে নূতন ছাঁচ আমদানী করিয়া, তাহার উপরে এই নূতন জীবনকে ঢালাই করিলে চলিবে না। আর দেশের এই পূর্ব্বাপর ধারাকে রক্ষা করিয়া এই নূতন সমন্বয় সাধন করিতে হইলে, নিজেদের জাতির ভিতরকার ইতিহাসটা ভাল করিয়া ধরিতে হইবে। এইরূপ সমন্বয়-চেষ্টাই বর্ত্তমানের প্রধান কর্ত্তব্য।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুঃখী দাদা

১।

পিতৃহীন অষ্টমবর্ষীয় দুঃখীর মাতা, যখন প্রতিবেশিনী পুঁটির মাতার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া, তাহার দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের অবসান করিল, তখন পুঁটি দুই বৎসরের বালিকা। পুঁটির মাতা কায়স্থের ঘরের দরিদ্র বিধবা। তাহার স্বামী রামচরণ বাবুদের বাড়ী খানসামার কাজ করিত,—তাহাতেই তাহাদের সংসার একরকম চলিয়া যাইত।

পুঁটি দেখিতে বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। দরিদ্রের গৃহে এত সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া যাইত।

কিন্তু পুঁটুরাণী যে পরিমাণ সৌন্দর্য্য লইয়া এ সংসারে আসিয়াছিল, সেই পরিমাণ অদৃষ্টের জোর লইয়া আসে নাই। আসিয়া থাকিলেও তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত ছিল,—আপাততঃ কিছুই প্রকাশ পাইল না। পুঁটু যখন দেড় বৎসরের, তখন রামচরণ একদিন রাত্রে মনিব-বাড়ী হইতে আসিতে বৃষ্টিতে বড় ভিজিল। ফলে তাহার পরদিনই তাহার জ্বর আসিল। আট দিন বিষমজ্বরে ভুগিয়া, নয় দিনের দিন ভোর বেলা, পুঁটুরাণীকে ফেলিয়া, পুঁটুর মাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া, সে এ ভবের লীলাখেলা সাঙ্গ করিল। পুঁটু ও তাহার মাতা নিরাশ্রয় হইল।

পুঁটুর মা বুঝিল, শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে। পুঁটুর মা দরিদ্র হইলেও কখনও গৃহের বাহির হয় নাই, কাজেই সে চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

দেড় বৎসরের কন্যা লইয়া কোন গৃহে দাসীর কাজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না, তাহা সে বুঝিত। অনেক ভাবিয়া

সে পাড়ার কৈবর্ত্ত বৌ দুঃখীর মায়ের শরণাপন্ন হইল। দুঃখীর মা এক গৃহস্থের বাড়ীতে বাসনমাজা ঝিয়ের কাজ করিত। সে পুঁটুর মাকে দুই চারি স্থানে লইয়া গেল, কিন্তু তাহার কোলে এত ক্ষুদ্র শিশু দেখিয়া কেহই তাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিল না। কয়েক-দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরাশ হইয়া অবশেষে দুঃখীর মা বলিল,—"কায়েত দিদি, কোথাও চাকরি নেওয়া তোর হবে না। আর কখ-নও ঘরের বা'র হোস্‌নি, সে রকম ঝিয়ের কাজ তুই কর্‌তেও পার-বিনি! তুই ঘরে থেকেই ঠিকে কাজ কর্‌,—আমি তোকে কাজের খবর দেব।"

তারপর দুঃখীর মা'র প্রসাদাৎ পুঁটির মায়ের দিনগুলি এক-রকম করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। সে কোন বাড়ীর ঝিয়ের অসুখ হইলে দুদিন গিয়া বাটনা বাটিয়া দিয়া আসিত। কাহারও ঘরের তোলা বাসন মাজিয়া দিয়া আসিত। কাহারও বাড়ী বড়ি দেওয়া হইবে, সে গিয়া ডাল বাটিয়া ফেনাইয়া দিয়া আসিত। কোথাও বা আমসত্ব তৈয়ার হইবে, পুঁটির মা মেয়ে কোলে করিয়া গিয়া আম গুলিয়া ছাঁকিয়া দিয়া আসিত। কাহারও অবস্থা তেমন ভাল নয়, ধোপার বাড়ী কাপড় দেওয়া কষ্টকর, পুঁটির মা'র ডাক পড়িল, সে গিয়া কাপড়গুলি সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া দিয়া আসিল। কাহারও বৎসরকার ডাল ঝাড়িয়া বাছিয়া দিয়া আসিল,—কাহারও বা মসলাগুলি ঝাড়িয়া ধুইয়া শুকাইয়া দিয়া আসিল। এই সকল কার্য্য করিয়া সে যাহা পারিশ্রমিক পাইত, তাহা দ্বারাই তাহার সংসার একরকম চলিয়া যাইত।

এইভাবে ছয় মাস গেল। একদিন অকস্মাৎ তাহার অসময়ের বন্ধু কৈবর্ত্ত বৌয়ের অসময়ে ডাক আসিল। সে সকালে কাজে গিয়া এক ঘণ্টা পরেই শরীর অসুস্থবোধ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। তারপর বারদুই ভেদ ও বমি হইয়া তাহার নাড়ী ছাড়িয়া গেল। পুঁটির মা তাহার ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে

আরম্ভ করিল। বাক্‌শক্তি লোপ হইবার ঠিক পূর্ব্বে সে পুঁটির মায়ের হাতের উপর দুঃখীর হাতখানা তুলিয়া দিয়া বলিল,—"দুঃখী তোমার, দেখো"—আর কিছু বলিতে পারিল না। পুঁটির মা বলিল,—"তুই কিছু ভাবিস্‌নি বৌ, আমার পুঁটিও যে, দুঃখীও সে—তুই ইষ্টি-দেবের নাম কর্।" কৈবর্ত্ত বৌয়ের মৃত্যু-বিবর্ণ মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—তারপরেই সব ফুরাইল। দুঃখী "মাগো" "মাগো" বলিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। পুঁটুর মা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল।

২।

সে আজ চার বৎসরের কথা। দুঃখী এখন বার বৎসরের বালক, পুঁটি ছয় বৎসরের বালিকা। দুঃখী জাতিতে কৈবর্ত্ত হইলেও পুঁটির মা তাহাকে আপন সন্তানের মতই প্রতিপালন করিতেছে। পুঁটি তাহার সঙ্গে একত্র আহার করে, একত্র খেলা করে। রাত্রে ক্ষুদ্র শয্যায় পুঁটির মা তাহাদের উভয়কে লইয়াই শয়ন করে। দুঃখী নানাপ্রকারে তাহার সাহায্য করে। সে এখন কোথাও কাজ করিতে গেলে আর পুঁটিকে সঙ্গে লইয়া যায় না, দুঃখীই তাহাকে লইয়া ঘরে থাকে। তাহারা উভয়ে মিলিয়া রন্ধনের আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত করিয়া রাখে,—পুঁটির মা আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া রন্ধন চড়াইয়া দেয়। কোন দিন দুঃখী দুই এক পয়সার মাছ কিনিয়া আনে, বা কোন দিন কাহারও বাড়ী হইতে পুঁটির মাকে দু'এক খানি মাছ আনিয়া দেয়। পুঁটির মা নিজের অন্ন ব্যঞ্জন সরাইয়া রাখিয়া ভিন্ন হাঁড়িতে করিয়া তাহাদের সেই মাছ রাঁধিয়া দেয়। দরিদ্র হইলেও পুঁটির মা একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করে, কলিকাতার সাধারণ ঝিয়েদের মত সে মাছ মাংস খায় না। তবে সে সিদ্ধ চাউল খায়, আতপ চাউল খাইবার মত অর্থ-সংস্থান কোথায়? পুঁটির মাতা উঠানে লাউ কুমড়া কাঁচা লঙ্কা ও নানারকম শাক লাগাইয়াছিল। নিজেদের প্রয়োজন-

মত রাখিয়া বাকী তরকারী ও বড়ি, আমসত্ব ও সময়োপযোগী নানাবিধ আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সে দুঃখীর দ্বারা বাজারে পাঠাইয়া দিত। দুঃখী সে সকল বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিত। দুঃখী তাহার সংসারে আসিয়া যেমন ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াছিল, তেমন আয়ও বৃদ্ধি করিয়াছিল।

পুঁটির মা মনে মনে ভাবিত,—"দুঃখী এমন ভাল ছেলে, সে যদি কৈবর্ত্ত না হইয়া কায়েত হইত, তবে আমার পুঁটির বিবাহের ভাবনা থাকিত না। হায়! এ নিরাশ্রয় বিধবার মেয়ে কে বিবাহ করিবে ?"

কিন্তু তার এ ভাবনা আর বেশীদিন ভাবিতে হইল না। যমরাজা দেখিলেন, ইহারা ত বেশ সুখে আছে! কিছুতেই ইহাদের কিছু করা গেল না! তবে আর এক চাল চালা যাক্। যমরাজার খাতায় এবার পুঁটির মায়ের নাম উঠিল, এবং অল্পদিন পরেই তাঁহার বাহকগণ পুঁটির মায়ের নিতান্ত অমতে ধরিয়া বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে কাঁদিতে কাঁদিতে সে দুঃখীকে বলিল, —"দুঃখী বাবা! ছোট বোন্‌টি তোমার রইল, ভিক্ষে ক'রেই খেও, কিন্তু ওকে ফেলো না"। দুঃখী দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইয়া আকুল স্বরে রোদন করিতে লাগিল। পুঁটি ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না, হতভম্ব হইয়া গেল। পাড়ার কয়েকজন লোক আসিয়া মৃতদেহ সৎকার করিল।

দ্বাদশবর্ষীয় বালকের উপর এবার সংসারের ভার পড়িল। পুঁটি দিনরাত "মা" "মা" করিয়া অস্থির হয়,—দুঃখী তাহাকে আদর করিয়া, অনুনয় করিয়া খেলনার প্রলোভন দেখাইয়া কিছুতেই শান্ত করিতে পারে না। পুঁটির মায়ের বাক্সে সামান্য যাহা কিছু অর্থ ছিল, সৎকারের খরচ দিয়া দুই টাকা তের পয়সা রহিল। ঘরে সামান্য কিছু চাল ডাল ছিল, তাই দিয়া দুঃখী এক মাস চালাইল। দুঃখে কষ্টে মানুষ দুঃখী রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অপটু ছিল না। সে কোন

রকমে ডাল ভাত রাঁধিয়া লইত,—মাঝে মাঝে দুই এক পয়সার চুনা মাছ আনিয়া একটু অম্বল রাঁধিত। ক্বচিৎ দু'এক দিন একটি চিংড়ী মাছ বা কৈ মাছ আনিয়া সে পুঁটিকে ভাজিয়া দিত, নিজে লইত না। সন্ধ্যাবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পুঁটুর মাথা কোলে লইয়া সে নানা রকম হাস্যোদ্দীপক গল্প বলিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত। পুঁটি কখনও কখনও মায়ের দুঃখ ভুলিয়া গল্প শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইত, ও মাঝে মাঝে সোৎসুকে "তারপর" "তারপর" বলিয়া দুঃখীর আনন্দ বর্দ্ধন করিত। কখনও কখনও কিন্তু সে কিছুতেই ভুলিত না,—"মা" "মা" বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইত,—তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া সে দুঃখীর কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। দুঃখী তখন আর কিছুতেই তাহাকে জাগাইত না। কষ্টে, অতি কষ্টে ঘুমন্ত পুঁটিকে তুলিয়া সে ঘরে লইয়া যাইত। পুঁটির জন্য সে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছিল।

এক মাস গেল।—ক্রমে বাক্স শূন্য হইয়া আসিল, ভাণ্ডার শূন্য হইয়া আসিল। দুঃখী চক্ষে অন্ধকার দেখিল,—তাহার ক্ষুদ্র মস্তক আলোড়িত করিয়া সে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে এমন দিন আসিল যখন বাক্সে একটি পয়সা নাই, ঘরে এক কণিকা চাউলও নাই। দুঃখী চুপ করিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রহিল। বেলা হইলে যখন পুঁটু "দুঃখী দাদা, ক্ষিধে পেয়েছে" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন দুঃখী আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে বেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বেলা দ্বিপ্রহরে সে ভিক্ষা করিয়া দুই মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া ঘরে ফিরিল এবং অন্ন প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধেক পুঁটিকে খাওয়াইল, বাকী অর্দ্ধেক পুঁটুর রাত্রের জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে পুনরায় দাওয়ায় গিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

সহসা তাহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে যখন পুঁটির মায়ের প্রদত্ত বড়ি আচারাদি ও শাকসব্‌জী লইয়া বাজারে যাইত, তখন দেখিত অসংখ্য মুটে ঝাঁকা হাতে লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে। তাহারা ত মুটেগিরি করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে,—তবে দুঃখীই বা না পারিবে কেন? অবশ্যই পারিবে! সে মন স্থির করিয়া ফেলিল। পরদিন পাড়ার একজনের কাছে পয়সা ধার করিয়া সে ছোট দেখিয়া একটি ঝাঁকা কিনিল। সে প্রত্যহ বাজারে গিয়া অন্যান্য মুটেদের সঙ্গে রীতিমত কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। দুর্ব্বহ বোঝা মাথায় লইয়া চলিতে চলিতে যখন তাহার শরীর মন অবসন্ন হইয়া আসিত, তখনই পুঁটুর ক্ষুধাক্লিষ্ট মলিন মুখখানি স্মরণ করিয়া সে শরীর মনে অসীম বলের সঞ্চার করিয়া লইত। তাহার দায়ীত্ব-জ্ঞান, তাহার আত্মত্যাগ, তাহার স্নেহ-ভালবাসা দেখিলে কেহই তাহাকে দ্বাদশবর্ষীয় বালক মনে করিতে পারিত না। মাতৃহীন বালকের নিজের দুঃখ ভুলিয়া মাতৃহীনা শিশুকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস দেখিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করা কঠিন হইত। আরও দুই বৎসর কাটিল। দুঃখীর ছোট ঝাঁকার পরিবর্ত্তে বড় ঝাঁকা আসিল।

৩।

রাস-পূর্ণিমায় টালীগঞ্জে ভারি মেলা। বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া রন্ধন চড়াইয়া দিয়া দুঃখী কহিল, "পুটি, রাস দেখ্‌তে যাবি?" সোৎসাহে আট বৎসরের বালিকা পুঁটি কহিল,—"হ্যাঁ দুঃখী দাদা, যাব।" দুঃখী বলিল,—"রান্নাটা সেরে খেয়েদেয়ে নি, তারপর যাব।"

কিন্তু পুঁটির কি আর সহ্য হয়? সে ক্ষণে ক্ষণে "কখন্ যাব দুঃখী দাদা" বলিয়া প্রাণের আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। দুঃখী হাসিয়া বলিল, "আরে পাগ্‌লি, না খেয়েই যাবি? ক্ষিধেয় মরে যাবি যে?" অমনি তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া পুঁটি বলিল, "না দুঃখী দাদা, কখনও ম'রে যাব না। আচ্ছা, তুমি দেখে নিও, আমি একবারও বল্‌ব না যে ক্ষিধে পেয়েছে।" দুঃখী তাহাকে বুঝাইয়া

বলিল,—"না খেয়ে কি এতটা পথ হাঁটা যায়? আচ্ছা পঁুটি, তুই হেঁটে যেতে আস্‌তে পার্‌বি ত?"

হাসিয়া পঁুটি বলিল,—"তা আর পার্‌ব না? আমি রোজ কত হাঁটি তা জান? এ-ই এখান থেকে অ—ই শিবুদের ঘর পর্য্যন্ত কত বার হেঁটে যাই আসি।"

তাহার দীর্ঘ পথের অভিজ্ঞতা দেখিয়া দুঃখী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল,—"সে যে ওর চেয়েও অনেক বেশী পথ রে! আচ্ছা, তুই খানিক হাঁটিস্‌, খানিক আমার কোলে উঠিস্‌।" সবেগে তাহার ঝাঁকড়া চুলভরা মাথাটি নাড়িয়া পঁুটি বলিল,—"না বাপু আমি কোলে টোলে উঠ্‌তে পার্‌ব না,—এত বড় বুড় মেয়ে আবার কোলে ওঠে কি?"

দুঃখী বলিল,—"আচ্ছা পাগ্‌লি, তুই হেঁটেই যাস্‌, এখন যা ত থালা দুখানা নিয়ে আয়, ভাত হয়ে গেছে।"

আহারাদির পর দুঃখী পঁুটীকে সঙ্গে লইয়া টালীগঞ্জাভিমুখে রওনা হইল। তাহার কষ্টলব্ধ অর্থ হইতে চার আনার পয়সা সে কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া লইল। পঁুটু যদি সখ করিয়া কিছু কিনিতে চাহে, তবে আজ প্রাণ ধরিয়া কেমন করিয়া সে কহিবে যে পয়সা নাই। আহা! পঁুটু যে জীবনে কখনও ঘরের বাহির হয় নাই, —কিছু দেখে নাই!

যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া পঁুটু এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিল। কত লোকজন, সারি সারি কত দোকানপাট, তাহাতে রাশীকৃত কত জিনিসপত্র, কত রং-তামাসা, পুতুল-নাচ প্রভৃতি। পঁুটি হতভম্ব হইয়া গেল। দুঃখী তাহাকে দুই চারিটি খেলনা কিনিয়া দিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইলে, দুঃখী বলিল,—"পঁুটি, তুই এই গাছ-তলায় একটু বোস, আমি খাবার কিনে নিয়ে আসি, দেখিস্‌ যেন এখান থেকে কোথাও যাস্‌ নি।" দুঃখী খাবার কিনিতে একটু দূরেই গিয়া পড়িল। খাবার কিনিয়া ফিরিবার পথে সে দেখিল একস্থানে

জনতা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া কি দেখিতেছে। দুঃখী কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না—খাবারের ঠোঙ্গা হাতে করিয়াই সে অগ্রসর হইল। এক বেদিনী একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককে সম্মুখে বসাইয়া তাহার দাঁতের পোকা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের ঘিরিয়া কতকগুলি লোক বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতেছে। দুঃখীও ক্ষণেকের জন্য পুঁটির কথা ভুলিয়া, সেই দৃশ্যের পরিসমাপ্তি দেখিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পর, বেদিনীর কৃতকার্য্যতায় সেই জনতা যখন উৎসাহে কোলাহল করিয়া উঠিল তখন সহসা দুঃখীর স্মরণ হইল, গাছতলায় পুঁটি একা আছে।

সে একরকম ছুটিয়াই সেখান হইতে বাহির হইল। সেই গাছতলায় আসিয়া দেখিল পুঁটি সেখানে নাই! প্রথমে সে মনে করিল তাহার স্থান-ভ্রম হইয়াছে। সে সেখানকার সকল গাছতলাই দেখিল, কিন্তু কোথায় পুঁটি! সেই খাবারের ঠোঙ্গা হাতে দুঃখী তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত স্থানটি খুঁজিল, কিন্তু হায়! কোথাও পুঁটির দেখা পাইল না। সে যত প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকে "পুঁটি" "পুঁটি", তাহার চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহার কর্ণেই ফিরিয়া আসে। তাহার হৃদয়টা শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল! ওরে, পুঁটি যে তার সব! পুঁটিকে না পাইলে সে যে একদণ্ডও বাঁচিবে না। সে একই স্থানে পাঁচবার খুঁজিল, তবু আশা তার যায় না।

অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে অবসন্ন হইয়া যখন সে দেখিল পুঁটিকে পাইবার আর কোন আশা নাই, তখন সে খাবারের ঠোঙ্গা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। রাত্রি ক্রমেই গভীর হইল, সেস্থান জনশূন্য হইল। একজন পাহারাওয়ালা, যাইতে যাইতে লণ্ঠনের আলোকে দেখিল, একটি বালক ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া দুই হস্তে মাথার চুল ছিঁড়িতেছে। সে সযত্নে তাহাকে তুলিয়া তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে দুঃখী সব কথা

বলিল। কোমলকণ্ঠে পাহারাওয়ালা বলিল, "এখানে পড়ে থেকে আর কি করবে? আজ ঘরে যাও, কাল থানায় খবর দিও, যদি কিছু হয়।"

দুঃখী উঠিল। যন্ত্রচালিতের ন্যায় সে গৃহাভিমুখে চলিল। সমস্ত জগৎ আজ তাহার নিকট শূন্য! পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত, কিন্তু দুঃখীর নিকট আজ চতুর্দ্দিক অন্ধকার! বাতাসে যেন হাহাকার, পক্ষীর কণ্ঠে করুণ গীতি, বৃক্ষের মর্ম্মরে দুঃখতান! সমস্ত আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া একটা বিরাট শূন্যতা! বিদীর্ণপ্রায় বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে দুঃখী শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিল। গৃহের চতুর্দ্দিকেই পুঁটির স্মৃতি,—দুই হাতে চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া দুঃখী শয্যার উপর গিয়া পড়িল। তারপর বুকফাটা দুঃখে সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পুঁটিকে যে সে কতখানি ভালবাসিত তাহা ত সে এ ভাবে আগে বোঝে নাই! তা কি বোঝা যায়! প্রিয়জন যে আমাদের হৃদয় কতখানি জুড়িয়া থাকে তাহা ত আগে বোঝা যায় না! অভাবে তাহা আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি করাইয়া দেয়। কিন্তু হায়! তখন ত তাহা বৃথা! তাহাদের প্রতি কত অসমাপ্ত কর্ত্তব্য, কত অকথিত বাণী মনেই রহিয়া যায়। আমাদের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া সেইগুলির স্মৃতি হৃদয় মন জর্জ্জরিত করে!

৪।

সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। তারপর দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে,—দুঃখী আজিও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু সে দুঃখী আর নাই! মুখে হাসি নাই, পেটে অন্ন নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই। পরিধানে ছিন্ন বাস, মাথার চুলগুলা রুক্ষ। আজ দশ বৎসর সে পুঁটিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, তবু আশা তার যায় নাই। পুঁটি প্রাণে বাঁচিয়া

নাও থাকিতে পারে, একথা তাহার কথনও কল্পনায় আসে নাই। পুঁটিকে খুঁজিয়া বাহির করাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে এখনও প্রত্যহ ঝাঁকা হস্তে বাজারে গিয়া দাঁড়ায় সত্য, কিন্তু লোকে প্রায়ই তাহাকে ডাকিয়া পায় না। সে প্রত্যহ দুই চারিটা পয়সা পাইলেই আর কোথাও যায় না। সে আজ দশ বৎসর রন্ধন করিয়া খায় নাই, দুই চারি পয়সার মুড়ি বা চিঁড়াই তাহার একমাত্র আহার। অবশিষ্ট সময় সে পুঁটির সন্ধান করিয়া বেড়ায়। সে কলিকাতার প্রত্যেক রাস্তার প্রত্যেক গৃহে অসংখ্যবার সন্ধান করিয়াছে, তবু তার মন মানে না। লোকে এখন তাহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে করে। তাহাকে দেখিলে,—"ঐ রে সেই পাগল আবার এসেছে"—বলিয়া সকলে হাস্য বিদ্রূপ করে। কেহ কেহ বা তাহাকে নিকটে ডাকিয়া সস্নেহ প্রশ্ন করে, কেহ বা কখনও অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আহার করিতে দেয়। তাহার কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। লোকের আদর ও অনাদর তাহার সমজ্ঞান। সেসকল বিষয়ে চিন্তা করিবার তাহার অবসর নাই। এক পুঁটির চিন্তা ব্যতীত তাহার মনে অন্য চিন্তার স্থান কোথায়?

সুদীর্ঘ দশটি বৎসর সে অনন্যকর্ম্মা হইয়া পুঁটির সন্ধান করিতেছে। এই দশ বৎসরে তাহার প্রাণের ব্যাকুলতার কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই।

লোকে বলে সময়ই প্রকৃত শান্তিদাতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখকষ্টের তীব্রতা কমিয়া আসে। কিন্তু দুঃখীর ত তাহা হইল না। যত দিন যায়, তাহার হৃদয়ে পুঁটির স্মৃতি তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠে।

ওরে পুঁটিরে, তোর মনে এই ছিল! এইরূপ নির্ম্মম নিষ্ঠুরের মতই যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবি, তবে ঐ কোমল বাহু দুটি দিয়া অমন করিয়া জড়াইয়াছিলি কেন? ঐ সরল হাসি মধুর কথা দিয়া হৃদয়টাকে এমন করিয়া বন্ধন করিয়াছিলি কেন? সে যে

ভুলিবার নয়, সে যে ভোলা যায় না রে! হৃদয়ের এ আর্ত্তনাদ ত কিছুতেই ঘুচিবার নয়!

সুদীর্ঘ দশটি বৎসর সে অনাহারে, অনশনে, পুঁটিকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, কিন্তু কৈ কখনও একটু অবসাদের ভাবও তার মনে আসে নাই।

একদিবস দ্বিপ্রহরে দুঃখী পথপ্রান্তে একটি অট্টালিকার থামের গায়ে হেলান দিয়া নীরব নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সে তখন অত্যন্ত অন্যমনস্ক, তাহার উদাস দৃষ্টি যে কোথায় নিবদ্ধ তাহা সে বোধ হয় নিজেই জানে না, তাহার মন যে ঠিক কোথায় তাহাও সে জানে কিনা সন্দেহ।

রাস্তার কতকগুলি লোক জটলা করিয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ডেপুটি সতীশবাবুর পুত্রের কাল অন্নপ্রাশন। সতীশবাবু খুলনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া, শাঁখারিপাড়ায় বাসা করিয়াছেন। সতীশ-বাবুর মাতার বড় সাধ, মা কালীর প্রসাদ মুখে দিয়া নাতির অন্নারম্ভ করাইবেন। সতীশবাবুরও ইচ্ছা প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশন একটু ধূমধাম করিয়া করিবেন,—বন্ধুবান্ধব লইয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিবেন।

সতীশবাবুর লোকজন বাজারে আসিয়া জিনিসপত্র কিনিয়াছিল মেলা, কিন্তু তাহা বহন করিবার মুটে পাওয়া যাইতেছিল না। ইহাই এত কোলাহলের কারণ।

অনেক কষ্টে কতকগুলি মুটে জুটিল। তিনজনের বোঝা এক-জনের মাথায় চাপাইয়া দিয়াও দেখা গেল অন্ততঃ আর একজন না হইলে কিছুতেই চলে না। সহসা একজনের দৃষ্টি দুঃখীর উপর পড়িল। সে বলিল,—"ঐ পাগ্‌লাকে নেও না।" আর একজন বলিল,—"গেলে ত, ওর যে মর্‌জিমত কাজ।" সতীশবাবুর এক কর্ম্মচারী বলিলেন,—"বেশী পয়সা কবুল কর্‌লেও যাবে না?"

সে কথা শুনিয়া মুটেমহলে হাসির ধূম পড়িয়া গেল। একজন বলিল, "বাবু, ওর কি পয়সার লোভ আছে? পয়সার লোভ থাক্‌লে ও কত কামাতে পার্‌ত। ওর কাছে পয়সা আর ধূলা সমান।" সতীশবাবুর সেই লোকটি তখন বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি ওকে বুঝিয়ে নিয়ে আস্‌ছি।"

দুঃখী কিন্তু এ সকল কিছুই লক্ষ্য করে নাই,—এত কোলাহল তার কর্ণেও প্রবেশ করে নাই। সেই বাবুটি যখন আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন, তখন সে চমকিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ওহে বাপু, আমার একটু উপকার কর্‌তে পার?"

দুঃখী বলিল,—"কি বাবু?"

"আমাদের বাবুর ছেলের কাল ভাত। বাজার কর্‌তে এসে অনেক জিনিসপত্র কিনে ফেলেছি, নিয়ে যাবার লোক পাচ্ছি না। তুমি একটু এগিয়ে দিয়ে আস্‌বে? তা হোলে বড় উপকার হয়।"

ছোট্ট রকমের একটি নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখী বলিল,—"চলুন বাবু, কতদূর যেতে হবে?"

"বেশী দূর নয়, এই ২৯ নং শাঁখারিপাড়া।"

৫।

মোট লইয়া দুঃখী যখন ২৯ নং শাঁখারিপাড়ায় পৌঁছিল, তখন সেই গৃহে মহা কোলাহল লাগিয়া গিয়াছে। দুয়ারের দুই পার্শ্বে কদলী বৃক্ষের সম্মুখে মঙ্গলঘট বসিয়াছে,—বারান্দায় নহবত বাজিতেছে। নহবতের করুণ সুরে, কি জানি দুঃখীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। দুঃখী সকলের সঙ্গে উঠানে আসিয়া মোট নামাইল। সঙ্গের বাবুটি তাহাদিগকে বাহিরে গিয়া পয়সার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অন্যান্য মুটেরা গেল,—দুঃখী কিন্তু গেল না। সে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি তখন প্রাঙ্গণের পার্শ্বে, ক্রীড়ামগ্না, ফুটন্ত মল্লিকা ফুলের মত একটি তিন বৎসরের বালিকার

উপর পড়িয়াছিল। বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া দুঃখী প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল,—তারপর কি এক উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর মন কম্পিত হইতে লাগিল।

ওরে তুই কে রে? তোর মুখে যে সেই মুখখানি বসান! তাহার ইচ্ছা হইল সে ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার দশ বৎসরের বুভুক্ষিত হৃদয়ের ক্ষুধা মিটায়। সাহসে কুলাইল না,—যদি কেহ দেখিয়া ফেলে! তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে! সে একজন রাস্তার সামান্য মুটে,—হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার কোথায়? সে ক্ষুধিত তৃষিত নেত্রে বালিকার প্রতি চাহিয়া রহিল।

বালিকা কতকগুলি খেলনা লইয়া আপন মনে খেলিতেছিল, ও কত কি বকিয়া যাইতেছিল। দুঃখীর স্থির দৃষ্টি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে ফিরিল,—মধুর হাসি হাসিয়া বলিল,—"আমি নান্না ক'চ্ছি, তুমি ভাত খাবে?"

একি! একি প্রহেলিকা? এ যে সেই কণ্ঠস্বর! এই সময় বালিকার ঠাকুরমা আসিয়া বলিলেন,—"এখানে কি ক'চ্ছিস্ লতি, ঘরে যা। রোদে থাক্‌লে অসুখ কর্‌বে।" তারপর দুঃখীর প্রতি দৃষ্টি পড়াতে বলিলেন,—"ওমা, এই যে এখানে আর একজন মুটে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলে যে পয়সা নিয়ে চলে গেল, তুমি দাঁড়িয়ে কি কর্‌ছ? বৌমা, একজন মুটের পয়সা বাকী আছে, তাকে পয়সা দিয়ে যাও মা" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

"যাই মা" বলিয়া, ছয়মাসবয়স্ক গৌরবর্ণ নধরকান্তি শিশুক্রোড়ে একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া রমণী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। দুঃখীর দৃষ্টি সেদিকে ছিল না,—সে পলকহীন নেত্রে ক্ষুদ্র লতিকে দেখিতেছিল। লতি ঠাকুরমার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য খেলনা প্রভৃতি গুছাইতেছিল। রমণী যখন নিকটে আসিয়া বলিল, "পয়সা নাও"—তখন সে অন্যমনস্ক ভাবে হস্ত প্রসারণ করিল।

তাহার প্রসারিত হস্তে পয়সা দিতে গিয়া রমণী তাহার মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া একটু চমকিয়া উঠিল। তারপর আবার ভাল করিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—

"তুমি—তুমি কি দুঃখী দাদা?"

দুঃখী এবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। একি স্বপ্ন! না মায়া! এর মুখখানি ত ঠিক পুঁটির মত, কিন্তু তবু পুঁটি বলিয়া ত মনে হয় না! কিন্তু পুঁটি না হইলেই বা তাহাকে "দুঃখী দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিবে কে? সে হতভম্ব হইয়া রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিল। রমণী পুনরায় আগ্রহভরে বলিল,—"বলনা, তুমি কি দুঃখী দাদা? তোমাকে দেখে যে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে! বল বল, সত্য করে বল তুমি কে?"

দুঃখী প্রকৃতিস্থ হইল। অস্ফুট স্বরে একবার বলিল, "পুঁটি!" তারপর আর কথা বলিতে পারিল না। অশ্রুজলে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল,—দৃষ্টি লোপ পাইল। সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

তাহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আজ দশ বৎসর পর সে পুঁটির সাক্ষাৎ পাইয়াছে কিন্তু কি ভাবে! এর চেয়ে যে না পাওয়া ভাল ছিল! পুঁটি আজ ধনীর গৃহিণী, আর সে সামান্য রাস্তার মুটে। আর কি সে তাহাকে সেইরূপ স্নেহ ভালবাসা দিবার অধিকার পাইবে? আর কি পুঁটি তাহার আদরে গলিয়া গিয়া তাহাকে সেই রকম করিয়া "দুঃখী দাদা" বলিয়া ডাকিবে! এখন যে তাহাদের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

আর যে সহ্য হয় না রে! বুকটা যে ফাটিয়া যায়! কেন সে পুঁটির দেখা পাইল! সে যে দশ বৎসর অনাহারে, অনিদ্রায় রাস্তায় রাস্তায় পুঁটিকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে,—তাহার মধ্যে দুঃখ থাকিলেও একটা সুখও ছিল, একটা বিরাট আশা ছিল। আর আজ! আজ যে তাহার সকল আশার অবসান! পুঁটির নিকটে থাকিয়া পরের

মত ব্যবহার করা যে তাহার পক্ষে অসম্ভব! পুঁটি আজ ডেপুটির গৃহিণী ও সন্তানের জননী হইলেও, দুঃখীর নিকট সে ত চিরকাল তাহার আদরের ছোট বোনটিই থাকিবে! হায় ভগবান! তাহার অদৃষ্টে সকলই লিখিয়াছিলে, কেবল মৃত্যুই লেখ নাই!

সতীশবাবু ঘর হইতে ডাকিলেন,—"পুঁটু, সেকরা খোকার গয়না এনেছে, পছন্দ হয় কিনা দেখে যাও।"

পুঁটু দৌড়িয়া গিয়া স্বামীর হস্তধারণ করিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল,—

"ওগো, দেখ, দুঃখী দাদা এসেছে,—কিন্তু সে কেবলই কাঁদ্‌ছে, কোন কথার উত্তর দিচ্ছে না।" সতীশবাবু বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন,— "দুঃখী দাদা এসেছে! তুমি কি বল্‌ছ পুঁটি! দুঃখী দাদাকে কোথা থেকে কেমন করে পেলে?" পুঁটু চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল,—"আজ বাজার থেকে যে সব মুটে জিনিষপত্র এনেছে, পয়সা দিতে গিয়ে দেখি, তাদের মধ্যে একজন দুঃখী দাদা। তুমি শীঘ্র এস, তাকে তুলে ঘরে নিয়ে যাবে।" পুঁটি ফিরিয়া আসিয়া দুঃখীর হাত ধরিয়া বলিল,—"দুঃখী দা, ঘরে চল।" সতীশবাবু সস্নেহে বলিলেন,—"দুঃখী দা, কাঁদ্‌ছ কেন?" দুঃখী মুখ তুলিয়া দেখিল, উভয়ের মুখে কোমল দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর স্নেহমাখা। দুঃখী ভাবিল ইহারই নাম কি দয়া! পুঁটির ও তাহার স্বামীর কি তাহার মলিন বসন, ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া দয়া হইতেছে? ওরে না রে সে যে আরও অসহ্য! পুঁটির নিকট দয়ার দান সে ত কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবে না! তাহা অপেক্ষা পুঁটি তাহার হস্তে বিষপাত্র তুলিয়া দেয় না কেন?

কিন্তু না, তাহা ত নয়। পুঁটি ত তাহাকে সেই পূর্ব্বের মতই "দুঃখী দাদা" বলিয়া ডাকিয়াছে! সতীশবাবুও ত চিরপরিচিতের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেছেন। সে যে কি ভাবিবে তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না,—কাতর দৃষ্টিতে একবার পুঁটি ও একবার তাহার স্বামীর পানে চাহিতে লাগিল। সাশ্রুনয়নে পুঁটি

বলিল,—"কি হয়েছে দুঃখী দা, অমন কর্‌ছ কেন? চলনা ঘরে। ওগো, তুমি একবার ধরনা, দেখ্‌ছ না দুঃখী দা কি রকম করে কাঁপ্‌ছে!"

সতীশবাবু সযত্নে তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। পুঁটি তাহার কন্যাকে ডাকিয়া দুঃখীর নিকট বসাইয়া দিয়া, পুত্রকে তাহার কোলে দিয়া বলিল,—"এই নাও দুঃখী দা, আজ থেকে ওদের জন্য নিশ্চিন্ত হলুম। লতি, এই যে তোর দুঃখী মামা।"

দুঃখীর প্রাণটা জুড়াইয়া গেল।

৬।

তারপর পুঁটি দুঃখীর স্নানের আয়োজন করিয়া দিল। স্নানান্তে দুঃখী সতীশবাবু-প্রদত্ত শুভ্র বস্ত্র ও জামা পরিয়া আহারে বসিল। সতীশবাবুর আহার অনেক পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল,—তিনি আসিয়া দুঃখীর নিকট বসিলেন। পুঁটি কাছে বসিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহাকে ভোজন করাইল। সতীশবাবুর মাতাও তাঁহার আহ্নিক পূজা সমাপনান্তে, আহারাদি করিয়া সেখানে আসিলেন। দুঃখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এতকাল পরে তোমায় পেয়ে বড়ই সুখী হয়েছি বাবা! বৌমার মুখে তোমার কথা আর ধরে না,—সেই জন্যই তোমায় অচেনা মানুষ ব'লে মনে হোচ্ছে না।" দুঃখী কৃতার্থ হইয়া গেল।

আহার শেষ হইলে পুঁটি তাহার জন্য একটি ঘরে শয্যা পাতিয়া দিল। পান আনিয়া দিয়া তাহার নিকট বসিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল,—

"দুঃখী দা, সেই মেলার দিন তুমি যখন খাবার আন্‌তে গিয়ে দেরী কর্‌তে লাগ্‌লে, আমার বড় ভয় হোল, আমি কেঁদে ফেল্লাম। একটি আধ-বয়সী ভদ্রলোক আমার কান্না শুনে কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "কাঁদ্‌ছ কেন, খুকি?" তারপর আমাকে কোলে করে

তোমায় কত খুঁজে বেড়ালেন,—কোথাও তোমায় পাওয়া গেল না। তখন তিনি আমায় বল্লেন, "আমার সঙ্গে আজ আমার বাড়ী চল, কাল তোমার দুঃখী দাদাকে খুঁজে দেব।" আমি তখন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, কিছুই বল্লাম না। তিনি যখন গাড়ী করে আমায় নিয়ে তাঁর বাড়ীতে নাব্‌লেন, তখন যেন সব বুঝ্‌তে পার্‌লাম। 'দুঃখী দাদা' বলে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌লাম।"

দুঃখীর নয়নপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল।

পুঁটি বলিতে লাগিল,—

"তিনি আমায় কোলে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লেন,—"সুনী, এই মেয়েটি একা একা গাছতলায় বসে কাঁদ্‌ছিল,—আমি নিয়ে এলাম।"

সেই স্ত্রীলোকটি আমায় কত আদর কর্‌লেন, কত চুম খেলেন, কিন্তু আমার বুকটা ফেটে যেতে লাগ্‌ল। আমি আরও কান্না জুড়ে দিলাম। তাঁরা দু'জনে আমায় অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন,—"কেঁদনা লক্ষ্মীটি, কাল সকালেই তোমার দুঃখী দাদার কাছে দিয়ে আস্‌ব।" আমি সেই কথা শুনে একটু শান্ত হয়ে তাঁদের দেওয়া খাবার খেয়ে, তাঁদের বিছানায় শুয়ে পড়্‌লাম। সেই স্ত্রীলোকটি আমার কাছে শুয়ে, আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। সেই ভদ্রলোকটি এসে বিছানার পাশে বসে বল্লেন,— "সুনী, তোমার সন্তান নেই বলে বড় দুঃখ, তাই বুঝি ভগবান একে জুটিয়ে দিয়েছেন। একে দিয়েই সন্তানের সাধ মিটিয়ে নিও।" রমণী আমায় বুকে চেপে ধরে বল্লেন,—"তুমি সত্যি বল্‌ছ? একে আমায় দেবে? আবার ছিনিয়ে নিয়ে যাবে না ত?" তাঁর চক্ষে তখন জল। ক্ষুদ্র শিশু আমি, তখন কিছুই বুঝি নি, অবাক হয়ে তাঁদের কথা শুনছিলাম। এখন বুঝ্‌তে পারি সন্তানহীনা রমণীর বুভুক্ষিত হৃদয়ের বেদনা সেই কথাগুলির মধ্যে কেমন করে ফুটে উঠেছিল!

পুঁটুর নয়নে অশ্রু দেখা দিল,—সে অঞ্চল দ্বারা তাহা মার্জ্জনা করিয়া কহিতে লাগিল,—"আমি তখন আট বৎসরের বালিকা, কিন্তু সেই দিনকার কথাগুলি যেন ছবির মত আমার মনে আঁকা রয়েছে। আমি একটু পরে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম,—কিন্তু তারপর আমি তাঁদের কাছে শুনেছিলাম যে রাত্রে অনেকবার 'দুঃখী দাদা' 'দুঃখী দাদা' বলে কেঁদে উঠেছিলাম। তারপরদিন সেই ভদ্র-লোকটি আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আমাদের বাসা কোথায়? আমি ক্ষুদ্র শিশু, কিছুই বল্‌তে পার্‌লাম না। তারপর আমরা কি জাত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। বাঙ্গালীর মেয়ে আর কিছু না জান্‌লেও জ্ঞান হয়েই সে কি জাত তা জানে। আমি বল্লাম "আমরা কায়েত"—শুনে তাঁর মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। সে প্রফুল্লতার কারণও শেষে বুঝেছিলাম। পরে শুনেছিলাম তাঁরাও জাতিতে কায়স্থ। তিনি তারপর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'তোমাদের ঘরে আর কে আছে?' আমি বল্লাম, 'দুঃখী দাদা'। তিনি বল্লেন, 'আর কেউ না?' 'না'—'দুঃখী দাদা কে?' 'দুঃখী দাদা, দুঃখী দাদা—আবার কে?' আমি আর কি বল্‌ব?"

তারপর গদ্গদকণ্ঠে পুঁটু বলিল,—

"দুঃখী দাদার পরিচয় কি বলে দেব তখন ত বুঝি নি। মনের ভাব প্রকাশ কর্‌বার মত ভাষা আট বৎসরের বালিকা কোথায় পাবে? এখন বলি দুঃখী দাদা আমার সব। আমার বাপ মা ভাই বন্ধু সব।"

দুঃখীর চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুঃখীর নয়নও সিক্ত। সে বলিয়া যাইতে লাগিল,—

"সেই রাত্রেই তাঁরা আমায় নিয়ে অন্য স্থানে চলে গেলেন। পরে শুনেছিলাম সে জায়গার নাম কিশোরগঞ্জ ও তিনি সেখান-কার উকিল। তাঁরা আমায় নিজের মেয়ের মত পালন কর্‌-লেন,—একটু আধটু লেখাপড়া শেখালেন। ক্রমে আমি তাঁদের

ভালবাস্‌তে শিখ্‌লাম, সেই ভদ্রলোককে 'বাবা' ও তাঁর স্ত্রীকে 'মা' ডাক্‌তে শিখ্‌লাম। আমাকে পেয়ে তাঁদের বহুদিনের সঞ্চিত স্নেহরাশি যেন উথলে উঠ্‌ল। কিন্তু দুঃখী দাদা, অত সুখের মধ্যেও তোমার কথা একদিনের জন্যও ভুল্‌তে পারি নি। থেকে থেকে মনটা হু হু করে উঠ্‌ত। সেই সব ফেলে আমাদের সেই ভাঙ্গা ঘরে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা হোত।"

সতীশবাবু ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া দুঃখীর বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে ছুটীতে কিশোরগঞ্জে বেড়াতে গিয়েছিলাম বন্ধু পুলিনবিহারীর বাপ সেখানকার একজন ছোটখাট জমীদার। সেইখানে তাঁদের বাড়ীতেই একদিন পুঁটুকে দেখে তার পরদিন থেকে আর হৃদয়টাকে খুঁজে পাই না। অনেক সন্ধান করে দেখি সেটা শরৎবাবু উকীলের বাড়ী প'ড়ে রয়েছে। পুলিনের কাছে শুন্‌লাম কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে বলে কেউ পুঁটুকে বৌ কর্‌তে চায় না। লোকগুলোর আহাম্মুকি দেখে রাগও হোল, আবার আনন্দও হোল। ভাগ্যি কেউ এর আগে তাকে নিয়ে যায় নি! তারপর পুলিনবিহারীর সাহায্যে পুঁটুরাণীকে গৃহলক্ষ্মী করে, সর্ব্বস্ব তার পায়ে সমর্পণ করে আজ পাঁচ বৎসর, আঃ পরম সুখে আছি। বুঝেছ দুঃখী দা, বেশ আছি।"

তারপর সতীশবাবু হাত পা ছড়াইয়া বেশ আরাম করিয়া শুইয়া বলিলেন,—"ভাগ্যি পুঁটু কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে ছিল,—না হোলে এ হতভাগার উপায় কি হোত দুঃখী দা?"

পুঁটু এবার ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল। সতীশ-বাবু ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কহিয়া যাইতে লাগিলেন,—"এই পাঁচ বৎসরে এমন একটি দিনও যায় নি, যেদিন আমাদের মধ্যে তোমার কথা হয় নি। এমন একটি দিনও যায় নি, যেদিন তোমার কথা বলে পুঁটু চোখের জল ফেলে নি। তুমি এসেছ, এবার আ[illegible]

বেঁচেছি। একা একা সংসারটা নিয়ে মাঝে মাঝে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ি। তখন একটু সাহায্য করে এমন একটা লোক পাই না। ত্রিসংসারে এ হতভাগার ত কেউ নেই! বাপের এক সন্তান ছিলাম। এবার তুমি এসেছ, আমি নিশ্চিন্ত হোলাম। আর কিন্তু পালাতে পাচ্ছ না দুঃখী দা!"

দুঃখীর হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইয়া গেল। এই সময়ে সতীশ-বাবুর মাতা নাতিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া সেখানে আসিয়া বলি-লেন—"বলি বৌমা, আজ কি খাওয়া দাওয়া নেই? ভাত যে শুকিয়ে ছাই হয়ে গেল? এ আবাগের বেটার কি পেটে ক্ষিধেও লাগে না?"

শ্বশ্রূকে দেখিয়া পুঁটু অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিল,—সতীশবাবু ভাল মানুষের মত পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিলেন। পুঁটু শ্বশ্রূর কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিন রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া দশ বৎসর পরে দুঃখী গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল। দশ বৎসরের পর দুঃখীর হৃদয়ে শান্তি আসিয়াছে!

শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

৪। কোথা হইতে আসিল ?

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আদি কি ? এ কথা লইয়া বহুকাল হইতে বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়েও নানা মুনির নানা মত; এখনও কিছুই ঠিক হয় নাই। যাঁহার যেমন পড়াশুনা, যাঁহার যে শাস্ত্রে কৃতিত্ব, যিনি যে শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করেন, তিনিই আপনার মনের মত একটা আদি ঠিক করিয়া লন এবং সেই মতই প্রচার করেন। অনেকে আবার দুই চারি জনের মত লইয়া একটা সামঞ্জস্য করিতে গিয়াছেন। এইরূপে মত বহুসংখ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মত লোকে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না, যতই আলোচনা করে ততই ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে। তাই সেই মত-গুলির একবার চর্চ্চা করা আবশ্যক হইয়াছে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আদি কি ?

প্রথম মত এই যে, বুদ্ধদেব যজ্ঞে হাজার হাজার পশুবধ হয় দেখিয়া দয়ায় গলিয়া যান, ও যাহাতে পশুবধ নিবারণ হয়, তাহারই জন্য অহিংসা পরমধর্ম্ম—এই মত প্রচার করেন। বাস্তবিক তখন যজ্ঞে যে বিস্তর পশু বধ হইত সে বিষয়ে ত সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে অশ্বমেধ যজ্ঞের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে একটি ঘোড়া ও একটি ভেড়া মারার কথা আছে। কিন্তু যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে ঐ একটি ভেড়ার জায়গায় একটি হাজার ভেড়াবধের কথা আছে। তাহার পর সোমযাগ ত পশুবধ ভিন্ন হইতেই পারিত না। সোমযাগ যে কতরকম ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং কত পশু যে মারা হইত তাহারও ইয়ত্তা নাই। তাই দেখিয়া পশুবধ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। এ মত বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও

যজ্ঞে পশুবধ নিবারণ।

আছে। রামচন্দ্র কবিভারতী—যিনি বঙ্গদেশ হইতে লঙ্কাদ্বীপে গিয়া তথাকার রাজার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হন এবং বৌদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী এই উপাধি পান—তিনি নিজে প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বুদ্ধদেব যে বেদনিন্দা করিতেন একথা তিনি সহ্য কারতে না পারিয়া বলিয়াছেন,—বুদ্ধদেব শুদ্ধ সেই সকল শ্রুতির নিন্দা করিয়াছেন যাহাতে পশুবধের কথা আছে। সমস্ত বেদের নিন্দা তিনি একেবারেই করেন নাই।

জয়দেবও বুদ্ধ অবতারের স্তব করিতে গিয়া বলিলেন,

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্

অর্থাৎ তিনি মাত্র যজ্ঞবিধির শ্রুতিগুলির নিন্দা করিয়াছেন, অন্য শ্রুতির নিন্দা করেন নাই।

দ্বিতীয় মত এই যে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে উপনিষদের অদ্বৈত মত চলিয়া আসিতেছিল, বুদ্ধদেব সেই মতই আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাঁহার একটি নামই অদ্বয়বাদী। তাঁহার নির্ব্বাণ ও উপনিষদের অদ্বয়বাদে বিশেষ কিছু তফাৎ নাই। তবে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনীর গ্রন্থকার চিরঞ্জীব শর্ম্মা যেমন বলিয়াছেন, তুমি বল "আছে আছে আমি বলি নাই।" তোমার আমার এই কথার ভেদমাত্র, বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকে রামানুজের দল—

উপনিষদ্-ধর্ম্মের পরিণাম।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং
প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ।

বলিয়া গালি দিয়াছেন। তবে এ গালিতেও ঐ মতে একটু তফাৎ আছে। রামানুজীরা বলেন, শঙ্কর বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন, আর ওমতে বলে, উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব অদ্বয়বাদী হইয়াছেন।